দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

হিন্দু মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা
এক ব্রহ্মবিদ সন্ন্যাসীর বাস্তববোধ প্রতিফলিত
— পৃঃ ২৩

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের মাতৃশক্তি ভাবনা এবং প্রণব কন্যা সঙ্ঘ গঠন
— পৃঃ ২৭

৭৬ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।। ৬ ফাল্গুন, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ৬ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৯ ফেব্রুয়ারি - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

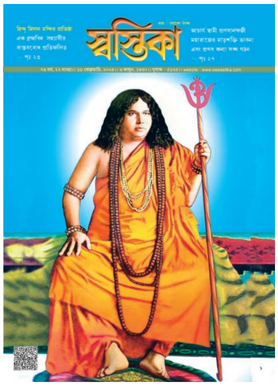

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘গায়ের জোরে রাখো মারো তাই শাসন তোমার টুটবে কবে’

লজ্জাবঙ্গ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

আহা কী আনন্দ বাজেটে বাজেটে ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

হিন্দুদের কাঁধে ধর্মনিরপেক্ষতার বোঝা

◻ ঈশকরণ সিংহ ভাণ্ডারী ◻ ৮

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার হাওয়া বুঝেই ইন্ডি জোট থেকে বিদায় নিয়েছেন ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১১

হিমালয়ের কোলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ১৩

অর্ধসত্য মিথ্যাকেও হার মানায় : সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন যেন আমি সত্যের অপলাপ করি

◻ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ◻ ১৫

ভারত সরকারের জলপথ পরিবহণ যোজনা

◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ১৬

এদেশের সভ্যতা সংস্কৃতি বিনষ্ট করার নতুন ষড়যন্ত্র

◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১৭

ভারতকে দিশা দেখাল কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী বাজেট

◻ ড. রামানুজ গোস্বামী ◻ ১৮

হিন্দু মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা এক ব্রহ্মবিদ সন্ন্যাসীর বাস্তববোধ প্রতিফলিত ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ২৩

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের মাতৃশক্তি ভাবনা এবং প্রণব কন্যা সঙ্ঘ গঠন ◻ সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দময়ী ◻ ২৭

কালীপদ অভিলাষী রানি রাসমণি ◻ অমিত ঘোষ দস্তিদার ◻ ৩১

রামেন্দ্র রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৩

বাংলাদেশে নির্বাচন মানে হিন্দুনির্যাতন, বাড়িঘর-মন্দিরে হামলা

◻ ৩৫

হারিয়ে যাওয়া ভাষা আন্দোলন ◻ ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি ◻ ৪৩

ভারতে গ্রিক আক্রমণ ও ভারতীয় যোদ্ধা

◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ৪৪

শুধু উত্তরাখণ্ডে নয়, সারাদেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চাই

◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৭

২০৩০ সালের মধ্যে সাত ট্রিলিয়ন অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে ভারত

◻ বিশ্বামিত্র ◻ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২১-২২ ◻ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯-৫০

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কমিউনিস্ট শাসন ও গণহত্যা

সমগ্র বিশ্বে মানবতার শত্রু হিসেবে পরিচিত কমিউনিস্ট শাসন। কমিউনিস্ট শাসন এবং সংগঠিত নরহত্যা সমার্থক হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। দীর্ঘ কমিউনিস্ট শাসন পশ্চিমবঙ্গেও সেই স্বাক্ষর রেখেছে রক্তের আখরে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট গবেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দুজাতির ত্রাণকর্তা

বঙ্গপ্রদেশে হিন্দুদিগের ত্রাতা হিসাবে তাঁহার আগমন। এক মাঘীপূর্ণিমায় তাঁহার আবির্ভাব, আর এক মাঘীপূর্ণিমা তাঁহার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা। তিনি স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। পূর্ববঙ্গের গ্রামে জন্মগ্রহণ করিবার ফলে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন জাতপাত, ছোঁয়াছুত ইত্যাদিতে শতধা বিভক্ত হিন্দু সমাজের দুর্দশা। আর সেই অনৈক্যের সুযোগ লইয়া বিধর্মীদের আস্ফালন। হিন্দুদিগের আত্মচেতনা জাগ্রত করিবার জন্য তিনি গ্রামে গ্রামে স্থাপন করিয়াছিলেন হিন্দু মিলন মন্দির। সকল শ্রেণীর হিন্দুকে সংগঠিত ও আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই মিলন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। পূর্ববঙ্গে বিশেষ করিয়া নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে বিধর্মীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া হিন্দুদিগের মনোবল বৃদ্ধি করিতেন। হিন্দু সম্মেলনগুলিতে গুরু গোবিন্দ সিংহ এবং ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের চিত্র রাখিয়া তিনি হিন্দুদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তাঁহার এইরূপ কর্মপ্রয়াসের জন্যই হিন্দু সমাজ তাঁহাকে ত্রাতার আসনে বসাইয়াছে। হিন্দু সমাজকে ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষা, সাধনা ও জীবনাচরণ সম্পর্কে সচেতন করাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। হিন্দুদিগের জাতিভেদ প্রথার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। সম্প্রদায়গত নাম না ধরিয়া তিনি সবাইকে হিন্দু বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তিনি হিন্দুদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে বলিতেন। দেশের অগ্রগতির জন্য তিনি সমাজের অবহেলিত মানুষদের উত্থানের উপর জোর দিতেন। উল্লেখ করিবার মতো বিষয় হইল, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ছাত্রাবাসগুলিতে দরিদ্র ও অবহেলিত শ্রেণীর ছাত্ররাই শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ পাইয়া থাকে। আরও উল্লেখ করিবার বিষয় হইল, আশ্রমে গুরু মহারাজের সন্ধ্যারতি অথবা সরস্বতী পূজা বিদ্যার্থীদিগের মধ্যেই কেহ করিয়া থাকে। বর্তমানে জনজাতি সমাজের যে অগ্রগতি তাহাতে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অবদান বহুলাংশে রহিয়াছে।

স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হইল তীর্থ সংস্কার। একশ্রেণীর পাণ্ডা তথা ধর্মব্যবসায়ীদের হাত হইতে তীর্থযাত্রীদের উদ্ধারকল্পে তীর্থস্থানগুলিতে সঙ্ঘের শাখা স্থাপন তাঁহার এক যুগান্তকারী কীর্তি। ইহার প্রথম প্রয়োগ তিনি করিয়াছেন গয়াধামে। ইহা ব্যতীত কুম্ভমেলা-সহ দেশের বিভিন্ন তীর্থস্থানে তীর্থযাত্রীদের সহযোগিতা ও নিরাপত্তা প্রদান সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা আন্তরিকতার সহিত করিয়া থাকেন। দেশের বিপদের দিনে আর্ত পীড়িত মানুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সহায়তার হস্ত প্রসারিত করা তাঁহাদের মুখ্য ধর্ম। আমফানের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে কিংবা করোনা মহামারীর দিনগুলিতে তাঁহাদিগের সেবার হস্ত দেশবাসী প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সেবাকার্যের নিমিত্ত হাসপাতাল পরিচালনা অথবা পাহাড়ে-জঙ্গলে জনজাতি-উপজাতিদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁহাদের মানবতার সেবায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের সক্রিয় সহযোগিতার কথা ইতিহাসে উল্লেখ না থাকিলেও দেশের মানুষ তাহা স্মরণে রাখিয়াছে। তিনি স্বয়ং মাদারিপুর বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। সেই অপরাধে কারাগার জীবনও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। বর্তমান কালেও দেশের জাতীয় আন্দোলনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সক্রিয়ভাবে হিন্দু সমাজের সহিত রহিয়াছে। গোহত্যা নিবারণকল্পে আন্দোলন অথবা শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনে তাহারা পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছেন। শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে অযোধ্যার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সপ্তাহব্যাপী প্রতিদিন দশ সহস্র তীথযাত্রীকে প্রসাদ বিতরণ করিয়াছে, ইহা কম কথা নহে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শাখা আজ দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, গায়ানা, ত্রিনিদাদ, টোবাকো, ফিজি প্রভৃতি দেশেও ছড়ায়ে পড়িয়াছে। সর্বত্র আর্ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত রহিয়াছেন সঙ্ঘের সন্ন্যাসীকুল। নারীশক্তি জাগরণের জন্য সত্তরের দশকে শুরু হইয়াছে প্রণব কন্যা সঙ্ঘ।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ নিঃসন্দেহে হিন্দু সমাজের একান্ত আপনার সংগঠন। হিন্দু সমাজের যে কোনো বিপদে সঙ্ঘের সন্ন্যাসীকুল অগ্রগামী। গুরু মহারাজ হিন্দুজাতিকে মহামুক্তি ও আত্মোপলব্ধির বাণী প্রদান করিয়াছেন। দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতাকে মহাপাপ বলিয়াছেন। ত্যাগ, সত্য ও ব্রহ্মচর্যকে ধর্ম বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় হিন্দুজাতির জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদকে জাতীয় নেতা নির্বাচন করিয়াছেন। তাঁহার আশীর্বাদে শ্যামাপ্রসাদ পাকিস্তানের গ্রাস হইতে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ছিনাইয়াছেন। শ্রীগুরু মহারাজের ভবিষ্যবাণী সফল হইতে চলিয়াছে। বর্তমান ভারতে মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসমন্বয় ও মহামুক্তির যুগ শুরু হইয়াছে। তাঁহার বাণীর সার্থক রূপায়ণ ঘটিতে শুরু করিয়াছে।

সুভাষিতম্

গুণঃ ভূষয়তে রূপং শীলং ভূষয়তে কুলম্।
সিদ্ধিঃ ভূষয়তে বিদ্যাং ভোগঃ ভূষয়তে ধনম্।। (চাণক্যনীতি)

গুণের কারণে রূপ ভূষিত হয়, চরিত্রের কারণে বংশ উজ্জ্বল হয়, সিদ্ধির কারণে বিদ্যা ভূষিত হয় এবং সদুপযোগের কারণে ধনসম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

‘গায়ের জোরে রাখো মারো তাই শাসন তোমার টুটবে কবে’

লজ্জাবঙ্গ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মমতা জমানায় পশ্চিমবঙ্গের নতুন নাম হয় ‘চোরবঙ্গ’। সন্দেশখালির ঘটনার পর নাম হয়েছে ‘লজ্জাবঙ্গ’। মমতা হয়তো বলবেন প্রতিবেদক রাজ্য বিরোধী। মমতাবঙ্গে যে দুর্নীতি চলছে এই প্রতিবেদক তার বিরোধী। কবি বলেছিলেন ‘শাসন তোমার টুটবে কবে’। মমতা জমানা শেষ হতে চলেছে। অপর্ণা আর কৌশিক সেনদের নাটুকেপনা শ্মশানে চিতা নিয়েছে। বিদেশি বাম দলের নেতা মিনাক্ষী, দীপ্সিতা, ঐশী আর সেলিমরা ব্রিগেডে ‘লাল গোলাম’ বলে আলিমুদ্দিনে সেঁধিয়ে গিয়েছেন। তারা হামাসের জন্য কাঁদেন। রামমন্দির, হলদোয়ানি, বিলকিস আর স্যান স্বামী ঘিরে প্রতিবাদ করেন। সন্দেশখালিতে নারীর সম্মান লুণ্ঠিত হচ্ছে তার খবর ছিল না? তাদের একসময়ের পালিত পশুরাই এখন ওখানে জঙ্গল চালাচ্ছে। তেরো বছর আগে রাজ্য থেকে বিদেশি বাম বিদায় নেয়। আগেই কবর খোঁড়া শুরু হয়। সত্তরোর্ধ মমতাকে সরাতে মনে হয় না মানুষের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে।

মমতার জলে বিজেপি, ডাঙায় অভিষেক আর শাহজাহান শেখ। তার কাকে বেশি ভয়? বিজেপি ডাঙায় উঠল বলে। ভাইপো অভিষেককে ‘ভ্যানিশ’ করেছেন মমতা। দুর্নীতিতে কপাল ডুবে মমতার। ভাইপোকে টানলে বাকিটুকু ডুবে যাবে। ঘর সামলাতে তিনি নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করেন না। সন্দেশখালিতে মানুষের প্রতিরোধ ঘটেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আড়ালে সেখানে প্রতি রাতে মহিলাদের মমতা-পুষ্টদের কাছে সমর্পণ করতে হয়। সেখানকার মায়েদের প্রতিদিনের সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার। ত্রিপলে মুখ ঢাকছে শাসক। প্রতিরোধের মুখেই ছুঁচোর গর্তে সেঁধিয়ে ছিল বিদেশি সিপিএম। এখন মমতার দুর্নীতি আর অত্যাচারের মুখ। দীপালি বসাক, তাপসী মালিকরা হারিয়ে গিয়েছে। কমিউনিস্টদের আমি ফ্যাসিস্ট বলি।

চৌত্রিশ বছর ধরে লাঠির জোরে তারা প্রমাণ করেছিল মার্কসবাদ সর্বশক্তিমান। সেই ফ্যাসিবাদী সিপিএমকে মমতা ছাপিয়ে গিয়েছেন। শ্রেণী রাজনীতিকে হাতিয়ার করে মানুষকে ঘৃণা শিখিয়েছিল সিপিএম। যুব কংগ্রেস চালু করেছিল গুন্ডা আর মাস্তান নীতি— ছিলাম নকশাল হলাম নব (নব কংগ্রেস), চাকরি না পেলে আবার হব। শ্রেণীশত্রু খতমের আড়ালে অতি বামেদের খোকামি রোগ দেখা দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে কংগ্রেস চালু করেছিল গণহত্যা। ক্ষমতায় এসে শ্রেণী বিভাজনকে হাতিয়ার করে হিংসা ছড়ায় সিপিএম। বাজারে নামায় কিছু মাতৃগর্ভের লজ্জাকে। এখন তারাই মমতার পাশে। সুকুর আলি আর তপন মণ্ডলের মতো নিকৃষ্টদের ‘দলের সম্পদ’ বলেছিলেন ‘পালিত ব্যুরোর’ (পলিটব্যুরো) নেতা বিমান বসু। পুলিশি পোশাকে ক্যাডার বাহিনীকে দিয়ে নিরীহ মানুষ খুনকে তারা বলত সূর্যোদয়।

একটা সময় ছিল বাম বিদেশিরা ভাবত তাদের অপসারণ অসম্ভব। বোকা বামেদের মতো তৃণমূলও তাই ভাবছে।

তৃণমূলের কাছে শাহজাহান শেখ বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তাই শাহজাহান, শিবু, উত্তম, ভাদু, অনুব্রত আর সওকতরাই মমতার আশ্রয়। সিপিএমের ছিল দুলাল, দিলীপ, জহর, খোকন, সুশান্ত আর সঙ্গে বংশগোপালরা। আর পুলিশ। বামেরা তাদের পালন করত। পুলিশের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করানো হতো। এখনও তাই। ২০০৪/০৫ সালে সন্দেশখালি সরবেড়িয়ার ত্রাস ছিল মামা-ভাগ্নে মোল্লা শেখ আর শাহজাহান শেখ। শাসন বারাসতের ত্রাস মজিদ মাস্টার। মমতা ব্যতিক্রমী নেত্রী নন। অত্যাচারী বাম আর গণহত্যাকারী কংগ্রেসের কাঁধে চেপেই তার বঙ্গদর্শন। তারা এখন কবরে। কবর থেকে তারা আর উঠবেন না।

তবে মমতার বন্দুকের নল ঘুরে গিয়েছে। তার দুধেল গাইরাও বিদ্রোহ শুরু করেছে। একটা সময় ছিল বাম বিদেশিরা ভাবত তাদের অপসারণ অসম্ভব। বোকা বামেদের মতো তৃণমূলও তাই ভাবছে। মমতার দলে অপ্রকৃতিস্থ একজন গান বেঁধেছিলেন ‘নিশানের নাম তাপসী মালিক’। তিনি এখন অসুস্থ। ভালো হয়ে উঠলে আশাকরি লিখবেন ‘পথের নাম সন্দেশখালি’। কবিগুরু বহুদিন আগেই লিখেছেন, ‘তোমার টানাটানি থাকবে না ভাই। হয় না যেটা সেটাও হবে আর রবার যেটা সেটাই রবে’। পার্থ, অনুব্রতরা জেল যাওয়ায় মমতার দাঁড় ভেঙে যায়। হয়তো আগামী মাসে আরও কেউ জেলে যাবেন। এবার অভিষেক আর শাহজাহান শেখদের হাত ধরে পালটাও ছিঁড়বে। এখন দেখার মমতার এই বিদায়কে কতটা তাড়াতাড়ি স্বাগত জানান রাজ্যের মানুষ। এই রাজ্যে সূর্যের রং লাল ছিল। সবুজ হয়েছে। আর এবার বোধহয় গেরুয়া হবে। □

আহা কী আনন্দ বাজেটে বাজেটে

উপুড়হস্তেষু দিদি,

সেদিন বাজেট পেশের আগে অর্থমন্ত্রী আপনাকে প্রণাম করছিলেন। আর বাজেট শোনার পরে মনে হলো আমিও দিদি আপনাকে একটা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। একেই বলে বাজেট! যাতে খরচের বন্যার সঙ্গে ধারের বন্যা রয়েছে। ঋণ করে ঘি খাওয়ার এমন বাজেট কে করতে পারে। আপনিই পারেন। এবং বলতে পারেন, এটা চমকে দেওয়ার মতো বাজেট।

লোকসভা ভোট আসছে। তার সঙ্গে রাজ্য সরকারের কোনও লেন-দেন নেই। লোকে ভোট দেবে কেন্দ্রের সরকার নির্বাচনের জন্য। মোদী সরকারের কাজ দেখে বিজেপিকে ভোট দেবে অথবা দেবে না। কিন্তু দিদি আপনি জানেন, মানুষকে কিনে নিতে। বাঙ্গালিকে আপনি চপ শিল্প চিনিয়েছিলেন। কিন্তু না বলেও একটা বিষয়ে আপনি সাফল্য পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ 'শিরদাঁড়া বিক্রি' শিল্পকে করায়ত্ত করে নিয়েছে। সন্দেশখালির হিন্দুবধূ বলছেন, দিনের পর দিন তৃণমূল নেতাদের ভোগের শিকার হচ্ছেন তাঁরা। কমবয়সি, সুন্দরী স্ত্রীদের পথ দেখিয়ে তৃণমূল নেতার খামার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হয় অসহায় হিন্দু স্বামীকে। বিনিময়ে শান্তি মেলে বেঁচে থাকার। কিন্তু তাতে রাজ্যের বাকি মহিলাদের কী আসে যায়! তাঁদের তো মাসে মাসে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এক ধাক্কায় দ্বিগুণ হয়ে গেল! বলতে খারাপ লাগছে তবু না বলে থাকা যায় না। যৌনপল্লির কর্মীরা কিন্তু দিনে কমপক্ষে এক হাজার টাকা রোজগার করেন। সেটা তাঁদের পেশা। কিন্তু জোর করে একই রাজ্যের মহিলাদের উপরে অত্যাচার হবে আর রাজ্যের বাকি মহিলারা মাসে এক হাজার টাকা পেয়ে সুখে থাকবেন! এটা আমি বিশ্বাস করতে চাই না।

কিন্তু দিদি, আপনি চমক দিয়েছেন। সরকারি কর্মচারীদের ডিএ বেড়েছে, সিভিক ভলান্টিয়ার থেকে শুরু করে হরেক কিসিমের চুক্তিভিত্তিক কর্মীর প্রাপ্যের পরিমাণও বেড়েছে। স্থায়ী চাকরির আশা ছেড়ে সিভিক, ভিলেজ পুলিশ হওয়ার জন্যও কি তৃণমূলকে রাজ্য বাঁচিয়ে রাখতে হবে? লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতার পরিমাণ বেড়েছে, বার্ধক্য ভাতাও। মিড-ডে মিল কর্মী থেকে মৎস্যজীবী, সবাই কিছু না কিছু পাচ্ছেন। সে টাকা আসবে কোথা থেকে কেউ জানেন না। চমক রয়েছে সেখানেই।

রাজ্যে শিল্প নেই, বাণিজ্য নেই, যথেষ্ট রাজস্ব আদায় হয় না, কিন্তু ধার আছে। সুদের উপরে সুদ দেওয়া রয়েছে। ভোটারকে খুশি করার সহজতম পন্থাটি হলো আরও বেশি ধার করা। যাতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ, রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সর্বনাশ হয়ে যাবে। এক শ্রেণীর ভোটারকে খুশি করতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের করের টাকায় সুদ দেওয়া চলবে। মোচ্ছব চলবে। এ বারের বাজেটে রাজ্য সরকার সেই বেপরোয়া পথে হেঁটেছে। বাজার থেকে আরও বেশি ঋণ নেবে ঠিক করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের থেকেও ঋণের পরিমাণ বাড়বে।

আমি জানি দিদি, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অনুপাতে ঋণের পরিমাণ ভারতের যে রাজ্যগুলিতে সবচেয়ে বেশি, পশ্চিমবঙ্গ সেগুলির অন্যতম। আমি জানি, এই রাজ্যের রাজস্ব ব্যয়ের সিংহভাগ শুধু বকেয়া ঋণের সুদ-আসল মেটাতে খরচ হয়। এর পর ধার আরও বাড়লে সে টাকার জন্য কি ফের ঋণ করবে রাজ্য সরকার? গর্ত খুঁড়ে গর্ত বোজালে একটা গর্ত থেকেই যায়। দিনের পর দিন গর্ত বাড়তেই থাকে। ঋণের দুষ্টচক্র এ ভাবেই সংসার থেকে সরকার সব রসাতলে যায়।

তবে দিদি, বাজেটে আশা করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিভিন্ন খাতে রাজ্যের প্রাপ্যের পরিমাণ গত অর্থবর্ষের তুলনায় এবার তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বাড়বে। তাহলে তো দিদি 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা'র রাজনৈতিক স্লোগান অচল হয়ে যাবে। সে কী আছে, মানুষ অত মনে রাখে না। আপনি ঠিকই করেছেন। ক'জন নাগরিক আর বাজেট পড়েন? দু'চার জন সাংবাদিক ছাড়া কারও পড়ার সুযোগও নেই। সেই সাংবাদিকদের আবার লেখার সুযোগও কম। মাথারা মানা করেন। আপনি অনেক মহান দিদি। ধার করে যে টাকার সংস্থান হবে, তা দিয়ে আপনার সরকারের বিবিধ প্রকল্প তো আছেই, তা ছাড়াও কেন্দ্র যেসব খাতে টাকা দিচ্ছে না, রাজ্য সেগুলো নিজের টাকায় করবে। এটা হাসির কথা নয়! টাকা নেই, কিন্তু দেমাক রয়েছে দিদি এই কথার মধ্যে। বছরে পঞ্চাশ দিন কর্মসংস্থান হবে কর্মশ্রী প্রকল্পে।

কিন্তু কাজ কই? এতদিন এই প্রকল্প করেন কেন? এই রাজ্যের বেশিরভাগ শ্রমিকই তো পরিযায়ী হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দিদি, রাজ্যের কাজ হলো কেন্দ্রের থেকে প্রাপ্য টাকা আদায় করা। তার জন্য সব নিয়ম মানা। কেন্দ্রকে বদলা নেওয়া নয়। কখনও কি কোনও রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে টাকার গরমে পেরে ওঠে?

আপনাকে আমি উপুড়হস্তেষু বলে সম্বোধন করেছি। কিন্তু হাত উপুড় করতে গিয়ে আপনি যে কথায় কথায় হাত পাতছেন সেটা বলতে লজ্জা লাগে দিদি, লজ্জা। □

রাজ্যে শিল্প নেই, বাণিজ্য নেই, যথেষ্ট রাজস্ব আদায় হয় না, কিন্তু ধার আছে। সুদের উপরে সুদ দেওয়া রয়েছে। ভোটারকে খুশি করার সহজতম পন্থাটি হলো আরও বেশি ধার করা। যাতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ, রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অতিথি কলম

ঈশকরণ সিংহ ভাণ্ডারী

হিন্দুদের কাঁধে ধর্মনিরপেক্ষতার বোঝা

প্রায় হারিয়ে যাওয়া পার্সি, মিশরীয় বা অন্যান্য প্যাগান বা পৌত্তলিকতাবাদী ধর্মমতের বিপ্রতীপে সনাতন হিন্দু ধর্মের নিজ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম নিরন্তর জারি রয়েছে, যা দমনে ব্রিটিশ রাজত্বে ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর মহম্মদ সেলিমের তরফে শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী নিহঙ্গ শিখদের বিরুদ্ধে দায়ের হয় প্রথম এফআইআর।

দেশের সমস্ত ধর্মীয় স্থানকে সুরক্ষার বিষয়টি প্রস্তাবিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু মন্দিরসমূহ পুনঃস্থাপনায় বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয় 'দ্য প্লেসেস অব ওয়রশিপ (স্পেশাল প্রভিশন) অ্যাক্ট, ১৯৯১' বা ধর্মীয় উপাসনা স্থান আইন। এহেন আইন প্রণয়নের বিপ্রতীপে রয়েছে বিগত এক হাজার বছর ধরে ভারতের ৪০ হাজারেরও বেশি মন্দিরের ওপর বিদেশি আক্রমণকারী ও হানাদারদের বর্বরোচিত আঘাত এবং মন্দিরগুলি ধ্বংস করে সেই মন্দিরগুলির ওপর তাদের উন্মত্ত উল্লাসের চিহ্নস্বরূপ সৌধ নির্মাণের বাস্তব ও ঐতিহাসিক সত্য। মন্দিরগুলির ওপর এই আক্রমণের মাধ্যমে চেপে দেওয়া হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার ভাবধারাকে, ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে।

এই আইন পাশের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় এই আইনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই আইন বিকৃতমনস্ক ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুযায়ী আত্মমর্যাদা, ভূ-সম্পত্তির অধিকার, মৌলিক অধিকার, সভ্যতা-সংস্কৃতিগত অধিকারের বিনিময়ে হিন্দুদের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে একটি ভয়ংকর বোঝা বহন করে চলার অন্যতম উদাহরণ।

উপাসনা স্থান আইনের সাংবিধানিক বৈধতা

উপরোক্ত বোঝা চাপানোর ক্ষেত্রে মূল বক্তব্যটি হলো যে এহেন আইন-কানুনের অনুপস্থিতিতে দেশে দাঙ্গা পরিস্থিতি ও তুমুল অশান্তি-অরাজকতার সম্ভাবনা রয়ে যায়। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ) ও জাতীয় নাগরিকপঞ্জী (এনআরসি) প্রণয়নের বিরোধিতায় শাহিন বাগের আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের পরিণতিতে দিল্লিতে সংঘটিত দাঙ্গায় সম্পত্তি ধ্বংস ও ৫৩ জনের মৃত্যু যার একটি সাম্প্রতিক নমুনাস্বরূপ। এই আইনের পক্ষে হাজির করা এহেন যুক্তিগুলি কার্যত বেআইনি কাজের সাফাই দেওয়া ছাড়াও অপরাধী এবং যারা অপরাধের শিকার তাদের একদৃষ্টিতে দেখার প্রচেষ্টার অঙ্গমাত্র। এই ধরনের অপপ্রয়াসের উদ্দেশ্যই হলো মানবিকতার নীতি ও আদর্শকে অস্বীকার করা, খর্ব করা। বিশ্বের পরাধীন ও নিপীড়িত জনতার প্রতিনিধি হিসেবে মার্টিন লুথার কিং যে আদর্শের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন—'ন্যায়বিচার ছাড়া শান্তি বিরাজ করা অসম্ভব' (without justice, there can be no peace)। উপাসনা স্থান সংক্রান্ত আইনের সাংবিধানিক বৈধতা, এই আইনের উপযোগিতা ও প্রয়োগের বিষয়ে পর্যালোচনার আগে প্রথমেই একটি মিথ্যের মিথকে ভাঙা বিশেষ প্রয়োজন। এই আইন সম্পর্কে প্রচারিত ডাহা মিথ্যেটি হলো এই যে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের তরফে দেওয়া শ্রীরামজন্মভূমি সংক্রান্ত রায়ে এই আইনটির সাংবিধানিক মান্যতাকে বহাল রাখা ছাড়াও সংবিধানের মৌলিক কাঠামো (basic structure) -র অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যিটা হলো এরকম কোনো কিছুই বাস্তবে ঘটেনি। বলাবাহুল্য যে সুপ্রিম কোর্ট তখনই কোনো আইন বা সেই আইনটির কোনো ধারাকে সমর্থন করে, বহাল রাখে বা খারিজ করে যখন সেই নির্দিষ্ট আইনটির বৈধতাকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়। উপাসনাস্থল আইনের ৫ নং ধারা অনুযায়ী রামজন্মভূমি মামলার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযুক্ত নয়। এই কারণে এই মামলার বিষয়ে এই আইনটির কোনো প্রসঙ্গ ছিল না বা সেই প্রসঙ্গের ভিত্তিতে এই আইনটির সাংবিধানিক বৈধতাকে নিয়ে কোনো প্রশ্নও সেই মামলায় স্বাভাবিকভাবে ওঠেনি, এই সংক্রান্ত কোনো আবেদনও দাখিল হয়নি, কোনো আইনি যুক্তি উঠে আসেনি এবং এইসবের ফলশ্রুতিতে এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতাও সেই রায়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়নি। এই মামলায় উপাসনাস্থান সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে আদালতের কিছু পর্যবেক্ষণ প্রকাশ্যে এলেও আইনি পরিভাষায় সেগুলি 'obiter dicta' অর্থাৎ রায়ের অপরিহার্য অংশ নয়। এইসব পর্যবেক্ষণ মামলার বিষয়ে গৃহীত আইনি সিদ্ধান্ত প্রদত্ত রায়ের 'ratio decidendi' (অর্থাৎ মূল বিন্দু বা প্রধান যুক্তি) নয়। ফলে এই ধরনের পর্যবেক্ষণ কোনো আইনি নজির হিসেবে পরিগণিত হবে না। রামজন্মভূমি মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ এই আইনটির বৈধতাকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকলে বা সেই রায়ের মাধ্যমে এইরকম কোনো আইনি দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলে সম্প্রতি এই আইনটির সাংবিধানিক বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করত না বা তার প্রেক্ষিতে নোটিশ ইস্যু (বিজ্ঞপ্তি জারি) করত না।

ধর্মীয় উপাসনাস্থল আইনটি কীভাবে অসাংবিধানিক সেই বিশ্লেষণ করলে বা তর্কের খাতিরে তার সাংবিধানিকতা আছে বলে ধরে নিলেও জ্ঞানবাপী, শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি এবং অন্যান্য অসংখ্য মন্দিরের ক্ষেত্রে এই আইনটি কোনো ভাবেই প্রযোজ্য নয়। এই আইন অনুসারে ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ক্ষেত্রে বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপ বা আইনি পর্যালোচনা (Judicial Review)-র ক্ষমতা লোপ পেয়েছে যা ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো আইন এই সাংবিধানিক কাঠামোর পরিপন্থী হলে তা হবে অসাংবিধানিক। 'এস.পি সম্পত কুমার ও অন্যান্য বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্য' মামলায় ৯ ডিসেম্বর ১৯৮৬-তে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এই বিষয়টির উল্লেখ করে বলা হয়েছে— 'মিনার্ভা মিলস্ লিমিটেড ও অন্যান্য বনাম ভারত সরকার ও অন্যান্য (তথ্যসূত্র: MANU/SC/0075/1980 : [1981] 1 SCR 206) মামলায় এই সর্বোচ্চ আদালতের ঘোষিত সিদ্ধান্তের পরিণতি হিসেবে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনা সংবিধানের একটি মৌলিক ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইন সেই আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে এই বৈশিষ্ট্যকে বাতিল বা হরণ করতে পারে না। বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতারহিত বা কেড়ে নেওয়া হলে তাতে কার্যত ঘটবে এই সংবিধানের পরিসমাপ্তি। এটি আমাদের সাংবিধানিক পরিকল্পনা বা ধাঁচার অন্তর্গত একটি মৌলিক নীতি যে রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ, সংবিধানের অধীনস্থ প্রতিটি কর্তৃপক্ষ সংবিধান থেকেই তাদের ক্ষমতা আহরণ করে এবং স্বীয় ক্ষমতার সীমার মধ্যেই তাদের কাজ করতে হয়। সংবিধানের অধীনে সরকারের ভূমিকা সীমাবদ্ধ এবং এই ক্ষেত্রে প্রশাসন ও আইনসভা উভয়কেই সংবিধানের অধীনে তাদের প্রদত্ত ক্ষমতার সীমার মধ্যে কাজ করতে হবে'।

ধর্মীয় উপাসনাস্থল আইনের যে ধারাটি উল্লেখযোগ্য এবং এই আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, সেই ৪(২) ধারায় বর্ণিত হয়েছে— 'এই আইন কার্যকরী হলে যদি ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে বিদ্যমান কোনো উপাসনালয়ের ধর্মীয় চরিত্র পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো মামলা, আপিল বা আইনি প্রণালী / বিচারবিভাগীয় কার্যক্রম কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারে বিচারাধীন থাকে, তবে তা বাতিল গণ্য করা হবে এবং এই আইন বলবৎ হওয়ার পর এই ধরনের কোনো বিষয়ে কোনো মামলা, আপিল বা অন্য কোনো আইনি কার্যক্রম কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকবে না'। অতএব, আদালত তথা বিচারবিভাগের এক্তিয়ার বা ক্ষমতা প্রয়োগের পক্ষে এই আইন বাধাস্বরূপ, যা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। নতুন মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহের বাধাদান ছাড়াও অমীমাংসিত, বিচারাধীন আপিলের ক্ষেত্রেও এই ধারাগুলি সৃষ্টি করে বেআইনি গতিরোধ। উদাহরণস্বরূপ, কোনো পক্ষ যদি মূল মামলায় জয়ী হয় বা তাদের পক্ষে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ লাভ করে, তবে উচ্চতর আদালত সেই মামলার আপিলের শুনানিতে অপারগ। আইনি প্রক্রিয়া অনুসারে কোনো পক্ষ সুপ্রিমকোর্টে মামলা দায়ের করার পর তা প্রত্যাহার করতে চাইলেও একমাত্র আদালতের অনুমতিক্রমেই তা সম্ভবপর হয়। সেখানে সংসদীয় ক্ষমতার অপপ্রয়োগের জোরে পাশ হওয়া এই আইন সব ধরনের মামলা, আপিল ও অন্যান্য আইনি কার্যাবলী স্তব্ধ করতে সক্ষম। উপাসনালয় সম্পর্কিত এই আইনের আরেকটি দিক হলো যে এই আইনটি— আইনি ও মৌলিক অধিকার লাভের লক্ষ্যে সকল নাগরিকের আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকারটিকেই মূলত হরণ করে। অনস্বীকার্য নিদর্শন ও জ্বলন্ত তথ্যপ্রমাণের উপস্থিতি সত্ত্বেও এই কালাআইনের দ্বারা বিচার বিভাগের ক্ষমতাকে খর্ব করার মাধ্যমে নাগরিকদের এই অধিকার হরণ, তাদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসেও জরুরি অবস্থার কালো দিনগুলিতে ঘটে গিয়েছে বিচারলাভে দেশকে বঞ্চিত করার মতো ঘটনা যখন হেবিয়াস কর্পাসের মতো সাংবিধানিক ধারার প্রয়োগও স্থগিত করা হয়েছিল। উপাসনালয় আইনটিও নাগরিকদের আইনগত অধিকার অনির্দিষ্টকাল স্থগিত করতে সক্ষম। কারণ ন্যায়বিচার প্রার্থনায় আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ। ন্যায়বিচারে বাধা, বিচারের গতিরোধ বা নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তিতে একটি আইনের অন্তরায় হয়ে ওঠা--- চূড়ান্ত অসাংবিধানিকতার পরিচায়ক।

সাংবিধানিক অন্তরাত্মা

ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা ড. বি.আর আম্বেদকর বলেছিলেন, 'যদি আমায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে এই সংবিধানের কোনো একটি বিশেষ অনুচ্ছেদের বিষয়ে উল্লেখ করতে বলা হয়— এমন একটি অনুচ্ছেদ যেটি ছাড়া সংবিধানটিরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে, তবে ৩২ নং অনুচ্ছেদ ছাড়া অন্য কিছুর উল্লেখ করতে আমি অক্ষম। এটিই সংবিধানের প্রাণ ও হৃদয় স্বরূপ'। এছাড়াও উপাসনালয় আইনটির অসাংবিধানিকতা প্রমাণে একাধিক আইনি যুক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেমন— এই আইনে মন্দির সমূহের সংস্কার ও পুনঃস্থাপনার বিষয়ে মামলা দায়ের করার ব্যাপারে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, সেখানে '১৫ আগস্ট, ১৯৪৭'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এইরকমভাবে উল্লেখিত সময়কাল পুরোপুরি মর্জিমাফিক এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও খামখেয়ালিপনার নিদর্শন। কারণ সংবিধানের ৩৭২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্রিটিশ-ভারত ও স্বাধীন ভারতের অস্তিত্বের আইনগত ধারাবাহিকতা বা বহমানতার যোগসূত্রটি গ্রথিত হয়েছে। এই আইনে একমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে শ্রীরামজন্মভূমির উল্লেখ এবং সেই স্থানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ভারত জুড়ে অন্যান্য অসংখ্য ধর্মীয় স্থানের নামোল্লেখ না থাকা সংবিধানের মাধ্যমে প্রতিফলিত আইনি সমতার ভাব ও মূল্যবোধেরও পরিপন্থী। উপাসনালয় আইনটির সাংবিধানিকতার প্রশ্নে দায়ের হওয়া মামলাটি বিচারাধীন হওয়ার কারণে তর্কের খাতিরে আইনটিকে সাংবিধানিক বলে ধরে নিলেও জ্ঞানবাপী, শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি ইত্যাদি মামলার ক্ষেত্রে এই আইনটি কোনো ভাবেই প্রযোজ্য নয়। জ্ঞানবাপী মামলার ক্ষেত্রে মুসলিম পক্ষের বক্তব্য হলো— যেহেতু সেখানে একটি মসজিদ বর্তমান, সেহেতু উপাসনালয় আইনের ৩ নং ধারা অনুযায়ী ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর তরফে সেই স্থানে সমীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। এই ধারায় বর্ণিত হয়েছে, 'উপাসনা স্থানের রূপান্তরণে নিষেধাজ্ঞা— কোনো ব্যক্তি কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী / শ্রেণী / সম্প্রদায়ের কোনো উপাসনালয় বা তার কোনো অংশকে একই

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোনো ভিন্ন উপাসনালয় বা কোনো ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বা তার কোনো বিভাগের উপাসনালয়ে রূপান্তরিত করবে না'। এই ৩ নং ধারাটিকে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ না করে এই ধারার আইনি ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ের রূপান্তরণে নিষেধাজ্ঞার আঙ্গিকটি বিচার করলেও, এই ধারা অনুসারে কোনো স্থানের ধর্মীয় চরিত্র নিরূপণে বা সনাক্তকরণে কিন্তু কোনো বাধা নেই। এটি একটি বাস্তবোচিত প্রশ্নের উদ্রেক করে যার মাধ্যমে উঠে আসে বাস্তব ও আইনের মিশেলে একটি বৃহত্তর প্রশ্ন। একটি ধর্মীয় স্থাপত্য একই সঙ্গে মন্দির ও মসজিদ হতে পারে না। উপাসনালয় সংক্রান্ত আইনটি 'ধর্মীয় চিহ্ন' বা 'ধর্মীয় চরিত্র'-এর কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ না করার দরুন কোনো স্থানের ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ হতে এখনও বিদ্যমান ধর্মীয় চরিত্র নিরূপণের ক্ষেত্রে সমীক্ষা এই আইন অনুযায়ী অনুমোদিত। এটিই এলাহাবাদ হাইকোর্টেরও মত যার ভিত্তি হলো সুপ্রিমকোর্টের তরফে ধর্মীয় চরিত্র চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে জ্ঞানবাপীর অভ্যন্তরে সমীক্ষার অনুমতিদান।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট হতে এখনও বিদ্যমান স্থানের ধর্মীয় চরিত্র পরিবর্তনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকার ফলে উপাসনালয়ের ধর্মীয় চরিত্র সনাক্তকরণের এই প্রক্রিয়ার প্রভাব হতে চলেছে দৃঢ়, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। কারণ '১৫ আগস্ট, ১৯৪৭' তারিখে ওই স্থানের ধর্মীয় চরিত্রকে— এই মামলার বাস্তবতা ও প্রযোজ্য আইনের আতসকাঁচে একত্রে পর্যালোচনা করতে হবে। মন্দিরের ক্ষেত্রে গৃহীত, সুপ্রতিষ্ঠিত আইনি তত্ত্ব অনুযায়ী এটা স্থির সত্য যে, কোনো স্থান একবার মন্দির রূপে পরিগণিত হলে, সেটি সর্বদাই একটি মন্দির— ছিল, আছে ও থাকবে।

শ্রীরামজন্মভূমি মামলায় আদালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, 'দেবমূর্তি ধ্বংসের ফলে ধার্মিকতার অবসান ঘটে না এবং ফলস্বরূপ ঐতিহ্য ও পরম্পরাগত উত্তরাধিকারও সমাপ্ত হয় না। এমনকী যেস্থানে মূর্তিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বা কিছুকাল মূর্তিটির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ইতিহাস রয়েছে, সেখানেও পরম্পরাগত ঐতিহ্যের মাধ্যমে দেবমূর্তিটি একটি আইনি চরিত্র পরিগ্রহ করে। দেবতা কোনো স্থানে স্বয়ম্ভু হওয়ার ক্ষেত্রে যেস্থানে তাঁর সেই প্রকাশ, সেই পুণ্য ভূমি ও তাঁর প্রকাশ হবে অবিচ্ছেদ্য। সর্বোপরি, উপরোক্ত বক্তব্যের কোনোটিই যদি গৃহীত না হয়, তবে অধিকাংশ মন্দিরের জন্য উপাসনালয় আইনটির ৪(৩)(ক) ধারাটি স্পষ্ট ভাবেই ব্যতিক্রমী, যেখানে বলা হয়েছে, '১ ও ২ নং উপধারার অন্তর্গত কোনো বিষয়ই প্রযোজ্য হবে না— (ক) উল্লেখিত উপধারায় সংশ্লিষ্ট কোনো উপাসনালয় যা একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সৌধ বা স্মৃতিস্তম্ভ বা দ্য এনশেন্ট মনুমেন্টস্ অ্যান্ড আর্কিওলজিকাল সাইটস্ অ্যান্ড রিমেইন্স অ্যাক্ট, ১৯৫৮ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীনে যেটি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন'। এইবার ১৯৫৮ সালের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান বা নিদর্শনের এই আইন অনুযায়ী কোন উপাসনা স্থলগুলি এই আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম এবং উপাসনালয় আইনের পরিধির বাইরে পরিগণিত হবে তা পর্যালোচনা করা যাক।

এএসআই আইনের ২(ক) ধারায় বলা হয়েছে: ''সংজ্ঞা: এই আইনানুগ, যদি না প্রেক্ষাপট অনুসারে অন্যথায় প্রযুক্ত হয়, (ক)'প্রাচীন সৌধ' অর্থ— কোনো কাঠামো, স্থাপনা বা স্মৃতিস্তম্ভ বা কোনো টিউমুলাস বা সমাধিস্তূপ বা প্রাচীন কবর, বা কোনো গুহা, শিলা ভাস্কর্য, শিলালিপি বা মোনোলিথ— যা ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বা শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং যা অন্তত একশত বছর ধরে বিদ্যমান। যার অন্তর্ভুক্ত—(১) প্রাচীন সৌধের নিদর্শন, (২) প্রাচীন সৌধ সংবলিত পুরাতাত্ত্বিক স্থান, (৩) কোনো প্রাচীন সৌধ বা স্তম্ভের স্থান সংলগ্ন জমির এমন অংশ যা বেড়া / পাঁচিল দেওয়া বা আচ্ছাদন বা অন্যথায় এই জাতীয় সৌধের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয়, এবং (৪) প্রাচীন সৌধটিতে যাতায়াত বা সৌধটি পর্যন্ত পৌঁছনোর, সুবিধাজনক পরিদর্শনের উপায় ও পদ্ধতি।" উপাসনালয় আইনের ৪(৩)(ক) ধারা ও প্রাচীন সৌধ সম্পর্কিত আইনের ২(ক) ধারানুযায়ী বিশ্লেষণ করলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি উঠে আসে তা হলো— 'যা একশত বছরের কম নয়, সেই সময় যাবৎ বিদ্যমান'।

একথা বলা অতিশয়োক্তি যে জ্ঞানবাপী, শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি-সহ ভারতের সকল প্রাচীন মন্দির উপরোক্ত শর্তটি পূরণ করে। যার ফলে উপাসনালয় সংক্রান্ত আইনের বিধিনিষেধের গণ্ডীর বাইরে সব ক'টি ধর্মীয় স্থান পরিগণিত হবে। সনাতন ধর্মের ওপর অন্যায়ভাবে বোঝা চাপানো উপাসনালয় আইনজাত ধর্মনিরপেক্ষতার সব চেয়ে জঘন্য, শোচনীয় উদাহরণ হলো— ভারত জুড়ে এই আইন বলবৎ হওয়ার পর মুসলমান-অধ্যুষিত জম্মু-কাশ্মীরে ২০০ মন্দির ধ্বংস, মন্দিরগুলিকে কার্যত গুঁড়িয়ে দেওয়া বা মসজিদে পরিণত করার সাম্প্রতিক ইতিহাস। নতুন ভাবে, নতুন আঙ্গিকে এই উপাসনালয় আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ প্রায় হারিয়ে যাওয়া পার্সি, মিশরীয় বা অন্যান্য প্যাগান বা পৌত্তলিকতাবাদী ধর্মমতের বিপ্রতীপে সনাতন হিন্দু ধর্মের নিজ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম নিরন্তর জারি রয়েছে, যা দমনে ব্রিটিশ রাজত্বে ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর মহম্মদ সেলিমের তরফে শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী নিহঙ্গ শিখদের বিরুদ্ধে দায়ের হয় প্রথম এফআইআর। এই চলমান সংগ্রাম তার মূল ভূমিতে রক্ষা করেছে ধর্মের অস্তিত্ব এবং বর্তমানে আপোশহীনভাবে এই সংগ্রামের ধারা একদা ধ্বংসপ্রাপ্ত ৪০ হাজার মন্দির পুনরুদ্ধারে অটল, অনড়, দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। যে সংকল্প যেন হয়ে ওঠে ল্যাটিন আইনি বাক্যাংশের মাধ্যমে বিধৃত অনাদি, চিরন্তন আইনি নীতি ও দর্শন— 'Fiat justitia ruat caelum' (ইংরাজি অর্থ— let justice be done, though the heavens may fall / বাংলা অর্থ— 'ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হউক, ফলশ্রুতি যদিও হয় স্বর্গ পতন! বা আকাশ ভেঙে পড়লেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক')-এরই জীবন্ত প্রতিধ্বনি।

(লেখক সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার হাওয়া বুঝেই ইন্ডি জোট থেকে বিদায় নিয়েছেন

আনন্দ মোহন দাস

সাম্প্রতিককালে বিহারের রাজনীতির পাশা উলটে যাওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। বিরোধীদের কেউ কেউ বলছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ইন্ডি জোটের পিণ্ডি চটকে নীতিহীন কাজ করেছেন। এ যেন ভূতের মুখে রামনাম। কিন্তু নীতীশ কুমার নির্বাচনে জয়লাভের পর যখন এনডিএ জোট থেকে বিহারে মহাগটবন্ধন জোটে যোগ দিয়েছিলেন, তখন কিন্তু বিরোধীরা সমালোচনা না করে তাঁর প্রশংসা করেছে। বলাবাহুল্য, নীতীশ কুমারের উত্থান কিন্তু বিজেপি তথা এনডিএর হাত ধরেই সম্ভব হয়েছে। বিরোধী জোটে থাকলে নীতীশ ভালো, আর বিজেপির সঙ্গে থাকলে তিনি ক্ষমতালোভী ও গণতন্ত্র বিরোধী, এটা কি দ্বিচারিতা নয়? আজকের অবক্ষয়ে দেনা-পাওনার রাজনীতিতে বিরেধীদের মূল্যবোধ খুঁজতে যাওয়াটাই নিজেদের চরিত্রের সঙ্গে বেমানান নয় কি? ভারতীয় রাজনীতিতে সর্বপ্রথম আয়ারাম গয়ারামের সংস্কৃতি কংগ্রেসই চালু করেছে। ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গুজরাটে বিজেপির শঙ্কর সিংহ বাঘেলাকে মুখ্যমন্ত্রীর টোপ দিয়ে কংগ্রেস বিজেপি সরকার ভেঙে নিজেদের সরকার গঠন করেছিল এবং বাঘেলা-সহ বিজেপি বিধায়কদের অনৈতিকভাবে নিজেদের দলে যোগদান করিয়েছিল।

কংগ্রেসের শাসনকালে ৩৫৬ ধারা জারি করে প্রায়শ অনৈতিকভাবে বিরোধী দলের সরকার ভেঙে দেওয়া কি নৈতিকতার কাজ ছিল? বর্তমানে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা মূল্যবোধ, নীতি ও আদর্শকে বন্ধক রেখে রাজনীতি করে থাকেন। যদিও রাজনীতির প্রকৃত অর্থ হলো 'নীতির রাজা' কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমানে তা রূপন্তরিত হয়ে দাঁড়িয়েছে 'রাজার নীতি' অর্থাৎ নেতা-নেত্রীর নিজস্ব নীতি হলো দলের রাজনীতি ও আদর্শ। এদের কাছে জনসেবার পরিবর্তে নিজ সেবাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। সেজন্য বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল আদর্শহীন ও দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত। এরা দলের ও পারিবারিক স্বার্থরক্ষাই সর্বাগ্রে রাখে। তাই এদের কাছে মূল্যবোধ হলো মূল্যহীন। সেই কারণেই রাজনীতিতে ভালো ও সৎ ব্যক্তিদের অভাব রয়েছে। ভারতীয় রাজনীতির ধারা সেই ভাবেই বয়ে চলেছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বিহারের মতো নাটক আরও মঞ্চস্থ হবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বর্তমান রাজনীতিতে সর্বদা লাভ-ক্ষতির অঙ্কই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। নীতীশের পালটি খাওয়ার পিছনে একই তত্ত্ব কাজ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই অনেকে তাই তাকে 'পালটুরাম' বলে কটাক্ষ করেছেন। সবই সাময়িক টিপ্পনী নীতীশ কুমার নিজেও জানেন। নীতীশ কুমার একবছর আগেও প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়।'

হঠাৎ কী এমন হলো যে নিজের থুতু নিজেকে গিলতে হলো অর্থাৎ ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে সেই বিজেপির সঙ্গে জোট করতে হলো। সেটাই আজকের নিবন্ধে আলোচ্য বিষয়। আগে বিজেপির সঙ্গে দু'বার বিশ্বাসঘাতকতা করার পরেও বিজেপি বিহারে লোকসভায় আসনসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও ইন্ডি জোটের পিন্ডি চটকাতে রাজ্য বিজেপির বিরোধিতা সত্ত্বেও তাকে এনডিএ-তে ফিরিয়ে নিয়ে উদারতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। শত্রু নিধনে কৌশল অবলম্বন অন্যতম হাতিয়ার। কারণ উত্তরভারতে এখনও ভোটের রাজনীতিতে জাতপাতের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই বিহারে কুর্মি, ভূমিহার ইত্যাদি ভোটের হার প্রায় ১৬ শতাংশ যারা নীতীশের উপর ভরসা রাখে। এই ভোট শতাংশ এনডিএ-তে ফিরলে এনডিএ ক্লিন সুইপ করবে। সেই গণিতকেই বিজেপি গুরুত্ব দিয়েছে এবং নির্বাচনের সময় সরকারে থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছে। এটার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। সেজন্য বিজেপি বাস্তব স্থিতি অনুধাবন করে আগামী লোকসভা নির্বাচনে জেডিইউকে এনডিএ-তে ফিরিয়ে নিয়েছে। বিজেপি কৌশলগত কারণে এক পা পিছিয়ে দু'পা এগিয়ে যাওয়ার তত্ত্বে আস্থা রেখেছে। তাছাড়া নীতীশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ এবং সুশাসন বাবু হিসেবে রাজনৈতিক মহলে তিনি সুপরিচিত।

শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির পুনর্নির্মাণের ফলে ভারতজুড়ে হিন্দুত্বের যে জাগরণ হয়েছে বা রামভক্তির যে পরিচয় পাওয়া গেছে তার ফসল বিজেপি নিশ্চিত ভাবে ঘরে তুলবে।

একথা সত্য যে বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করে নীতীশ কুমার বিহারে লালুর জঙ্গলরাজ খতম করেছিলেন। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে জেডিইউ দলের বিজেপির সঙ্গে আঁতাতের তাগিদ বেশি ছিল বলে অনেকে মনে করছেন। সেজন্য দলের ও নিজের স্বার্থে নীতীশ বিজেপির সঙ্গে অতীতের মন কষাকষি সত্ত্বেও সমঝোতা করতে বাধ্য হয়েছেন। সেই হিসেবে নীতীশ কুমার বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে। যদিও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা কেউ কেউ বিপরীত মতও প্রকাশ করেছেন। আগামী নির্বাচনে কে লাভবান হবে সেই চিত্র অবশ্যই পরিষ্কার হবে লোকসভা নির্বাচনের পরই।

প্রসঙ্গত, নীতীশের বিরোধী জোট গঠনে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হওয়ার পেছনে মূল কারণ ছিল বিরোধী জোটের মুখ হয়ে প্রধানমন্ত্রীর

ফঃ ২

দাবিদার হওয়া। কিন্তু যখন ইন্ডি জোটের মুখ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম প্রস্তাব করলেন, তখনই নীতীশ কুমার রণে ভঙ্গ দিয়ে বিরোধী জোট ছেড়ে এনডিএ-তে ফিরে আসার মনস্থির করে ফেললেন। সেজন্য তলায় তলায় বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখলেন। সূত্র মারফত জানা যায় এই প্রয়াস নাকি গত ডিসেম্বর মাস থেকে চলেছিল। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী জোটে তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখেই বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি বিহারে মুখ্যমন্ত্রীর গদি বজায় রাখলেন। অন্যথায় তেজস্বী যাদবের হাতে তামাক খেতে হতো। তাছাড়া দুর্নীতিগ্রস্ত ও আদর্শহীন ছাব্বিশ দলের বিরোধী জোটের সকলেই প্রধানমন্ত্রী হতে চায়। সেজন্য নীতীশ কুমার দলের সামান্য আসনের বিনিময়ে লড়াইয়ে যে থাকতে পারবেন না তা তিনি বিলক্ষণ বুঝেছিলেন।

বিহারে লালুপুত্র তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়ার জন্য নিরন্তর চাপও ছিল। এক্ষেত্রে লালুপ্রসাদ যাদব পুত্রস্নেহে মহাগটবন্ধন জোটের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে অতি সত্বর নীতীশকে সরিয়ে ছেলেকে মুখ্যমন্ত্রী করার জন্য নীতীশের দলকে ভেঙে নিজের দল ভারী করার প্রয়াস শুরু করেছিলেন। সেই অবস্থায় দল ভেঙে গেলে নীতীশ রাজনীতিতে অপ্রসঙ্গিক হয়ে পড়তেন। নিজের দল ও মুখ্যমন্ত্রিত্ব দুটোই হাতছাড়া হতো। সেই অর্থে সঠিক সময়ে নীতীশ কুমার বিজেপির উপর ভরসা রেখে দুই কূল বাঁচিয়েছেন। আর অন্য দিকে বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে তার আসনসংখ্যা অধিক সংখ্যায় বাড়িয়ে নেওয়ার পথ মসৃণ করেছে। নীতীশের জোট বদলে বিরোধী জোট বিশেষ করে বিহারে বিরাট ধাক্কা খেয়েছে এবং এনডিএ জোট লাভবান হয়েছে। নীতীশ কুমার ছেড়ে দেওয়ার পর ক্রমশ ইন্ডি জোটের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটতে চলেছে।

কিন্তু আসনরফা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে রাজ্যে বিরোধী জোটের করুণ অবস্থা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জি একাই লড়বেন। কারণ কংগ্রেসকে ২-৩টি আসনের বেশি ছাড়তে চান না। পঞ্জাব ও দিল্লিতে কেজরিওয়াল কংগ্রেসকে সামান্য আসন ছেড়ে অন্যত্র কংগ্রেসের কাছে আসনরফা চায়। সেজন্য কংগ্রেস রাজি নয়। উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টি কংগ্রেসকে ১১টির বেশি আসন ছাড়তে রাজি নয়। কেরালায় বামপন্থীরা কোনোভাবেই কংগ্রেস-সহ ঘটকদলকে আসন ছাড়তে রাজি নয়।

সুতরাং আসন সমঝোতা হবার সুযোগ খুব একটা নেই। তাই ভূভারতে ইন্ডি জোট এখন ঘেঁটে গেছে। কারণ জোটের সমস্ত দলই বিশেষ করে আঞ্চলিক দলগুলি নিজেদের আসন সংখ্যা নিজের এলাকায় বাড়িয়ে নিয়ে ভবিষ্যতে দরকষাকষিতে এগিয়ে থাকতে চায়। কারণ এই দলগুলির কোনো আদর্শ নেই, ন্যূনতম কর্মসূচিও নেই। কংগ্রেসও জোট নিয়ে খুব একটা সিরিয়াস বলে মনে হয় না। তা না হলে এই সময় লোকসভার আসন সমঝোতা ও কৌশল নিয়ে মনযোগ না দিয়ে রাহুল গান্ধী ন্যায়যাত্রা বের করে দেশ ভ্রমণ করছেন? কংগ্রেস কর্মীদের ভোটের কাজে না লাগিয়ে ন্যায় যাত্রায় যুক্ত করেছে যেখানে অন্য দল লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। সেজন্য কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও উত্তরপ্রদেশের নেতা আচার্য প্রমোদ কটাক্ষ করে বলেছেন, যাত্রা দেখে মনে হয় কংগ্রেস ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

উত্তরপ্রদেশে চৌধরী অজিত সিংহের ছেলে জয়ন্ত চৌধরীও এনডিএ জোটের দিকে এক পা বাড়িয়ে রয়েছে। আগামী লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসলে ততই বিরোধী জোটের ছবি পরিষ্কার হবে। বিরোধী জেটের সব ঘটকদল জানে তাদের কাছে নরেন্দ্র মোদীর মতো ভাবমূর্তি সম্পন্ন কোনো কুশলী নেতা নেই এবং নির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচিও নেই। কেবলমাত্র মোদীকে পরাজিত করাই হলো একমাত্র লক্ষ্য। এইভাবে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে পরস্পর বিরোধী জোটের দ্বারা বিজেপির মতো সাংগঠনিক দলকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনকল্যাণমুখী কর্মসূচিগুলি জনমানসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সর্বোপরি অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের পুনর্নির্মাণের ফলে হিন্দুত্বের যে জাগরণ হয়েছে তার ফসল বিজেপি যে লোকসভা নির্বাচনে তুলবে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই ডুবন্ত জাহাজ থেকে সবাই পালিয়ে বাঁচতে চাইছে।

লোকসভা আসনের পরিসংখ্যানগত দিক থেকেও বিজেপি তথা এনডিএ অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। বড়ো রাজ্য হিসেবে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, গুজরাট, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে লোকসভার সর্বমোট ৩৮৬টি আসন রয়েছে যেখানে অধিকাংশ রাজ্যেই বিজেপির সংগঠন অনেক শক্তিশালী। বর্তমান স্থিতি অনুযায়ী এই রাজ্যগুলি থেকে বিজেপি সহজেই ২৫০-২৬০টি আসন পেতে পারে এবং জোটসঙ্গী ধরলে মোট ২৯০-৩০০টি আসন পেতে পারে। এছাড়া অন্যান্য ছোটো রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট আসন সংখ্যা রয়েছে ১৫৭। এই রাজ্যগুলি হলো, উত্তর পূর্বাঞ্চলের অসম, ত্রিপুরা-সহ সাতটি রাজ্য, গোয়া, দিল্লি, পঞ্জাব, ছত্তিশগড়, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, আন্দামান, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খণ্ড, লাক্ষাদীপ, দমনদিউ, হিমাচল ইত্যাদি। এই রাজ্যগুলিতে বর্তমান শক্তি অনুযায়ী ১৫৭টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই ৭০-৮০টি আসন অনায়াসে পেতে পারে এবং জোটের অন্য শরিকরা ১০টি আসন পেতে পারে।

সর্বসাকুল্যে ৫৪৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি একাই ৩২০-৩৪০টি আসন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং জোট ৩৭০-৩৯০টি আসন পেতে পারে। যদিও নরেন্দ্র মোদী দাবি করেছেন বিজেপি এককভাবে ৩৭০টি আসনে জয়লাভ করবে। বিজেপি একাই তিন শতাধিক আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করবে বলে রাজনৈতিক মহলও নিশ্চিত। সম্ভবত লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা আর এক মাসের মতো বাকি রয়েছে। কিন্তু আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী জোটের অবস্থা যে ভালো নয় তা শরিকদলগুলি বিলক্ষণ বুঝেছে। সেজন্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সবাই সোচ্চার হয়েছে। বিগত পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস তিনটি রাজ্যে শাসন ক্ষমতা হারানোয় কংগ্রেসকে জোট রাজনীতিতে দুর্বল করেছে। সেই সুযোগে আঞ্চলিক দলগুলিও দরকষাকষিতে এগিয়ে গেছে। অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির উদ্‌ঘাটনে বিরোধী জোটের অনুপস্থিতিও ভোটের বাক্সে বিরূপ প্রতিফলন ঘটবে যা বিজেপিকে ভারত জুড়ে লাভবান করবে। তাছাড়া অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির পুনর্নির্মাণের ফলে ভারতজুড়ে হিন্দুত্বের যে জাগরণ হয়েছে বা রামভক্তির যে পরিচয় পাওয়া গেছে তার ফসলও বিজেপি নিশ্চিত ভাবে ঘরে তুলবে। সুতরাং আগামী লোকসভা নির্বাচনে মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ জোট যে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পুনরায় শক্তিশালী সরকার গঠন করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং মোদীর নেতৃত্বে নব ভারতের উদয় ঘটবে। □

হিমালয়ের কোলে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা

ধর্মানন্দ দেব

ভারতের পবিত্র সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৪তম অনুচ্ছেদে একটিমাত্র বাক্য লেখা রয়েছে; কিন্তু সেটি এক সুস্পষ্ট নির্দেশ তাতে ভুল বোঝা বা বোঝানোর কোনো উপায় নেই কারোর। আলোচনার শুরুতে সেই বাক্যটি উল্লেখ না করে পারছি না— 'The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.' সুতরাং আজ যে বিতর্ক ঘনিয়ে উঠেছে— অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করতে চাওয়ায় যে হইচই শুরু হয়েছে সরকারের বিপক্ষে, তার কি কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি আছে? এক কথায় উত্তর দিয়ে বলা যায় কোনো সাংবিধানিক ভিত্তি নেই। সংবিধান প্রণেতারা ভারতের জন্য একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর কথা বলেছিলেন। কিন্তু এতদিন তা প্রণয়নের কোনও চেষ্টাই করা হয়নি। আসুন জেনে নেওয়া যাক, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আসলে কী। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড দেশের সকল সম্প্রদায়ের জন্য এক ও অভিন্ন আইনের কথা বলে। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, দত্তক ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য একটিই আইন থাকবে। সংবিধানের ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদেও বলা হয়েছে, ভারতব্যাপী নাগরিকদের জন্য একটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি তৈরির চেষ্টা করবে সরকার।

উত্তরাখণ্ডে বিজেপি ২০২২-এর বিধানসভা ভোটে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যদিও গোটা দেশেই বিজেপি অভিন্ন বিধি চালু করা হবে বলে দলের জন্মলগ্নেই ঘোষণা করেছে। ১৯৬৭ সালে জনসঙ্ঘ দলের নির্বাচনী সংকল্পপত্রে প্রথমবার অভিন্ন দেওয়ানি বিধির উল্লেখ করা হয়। আমার মতো আজ অনেকেই মনে করছেন, গোটা দেশে চালু করার আগে কয়েকটি রাজ্যে তা বলবৎ করে বিজেপি দল প্রতিক্রিয়া যাচাই করে নিতে চাইছে সাধারণ মানুষের। উত্তরাখণ্ডকে এই ব্যাপারে দলের পরীক্ষাগার করা হলো বলা যায়। অনুমান করা হচ্ছে ২০২৪-এ মোদী সরকার বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর তা গোটা দেশে বলবৎ করা হতে পারে।

সে যাইহোক, উত্তরাখণ্ডে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি ২০২২ সালে ইউসিসি-র খসড়া তৈরির জন্য সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বে একটি প্যানেল গঠন করেছিল উত্তরাখণ্ড সরকার। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রমোদ কোহলি, সমাজকর্মী মনু গৌর, উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যসচিব শত্রুঘ্ন সিংহ এবং দুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরেখা ডাঙ্গওয়াল ছিলেন এই কমিটির সদস্য। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা হয় সুপ্রিমকোর্টে। মামলা নম্বর WP(C) No. 1086/2022। বিগত ৯ জানুয়ারি ২০২৩ সালে সুপ্রিমকোর্ট মামলাটি খারিজ করে বলে— Article 162 of the Constitution indicates that the executive power of a State extends to matters with respect to which the Legislature of the State has power to make laws–In view of the provisions of Entry 5 of the Concurrent List of the Seevnth Schedule, the constitution of a Committee per se cannot be challenged as ultra vires.

পরে ওই কমিটি ৭৪৯ পৃষ্ঠার চার খণ্ডে একটি খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করে। এই খসড়া তৈরি করার জন্য, প্যানেলটি লক্ষ লক্ষ প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করেছে, লিখিত ও অনলাইন। বেশ কয়েকটি পাবলিক ফোরাম এবং ৪৩টি পাবলিক আউটরিচ প্রোগ্রাম করেছে এবং ৬০ হাজারেরও বেশি লোকের সঙ্গে কথা বলেছে। সরকারের হাতে কমিটি এই বিশাল রিপোর্ট জমা দেয় গত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ সালে। আর এই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক এই সংক্রান্ত খসড়া বিল পেশ হয় উত্তরাখণ্ড সরকারের মন্ত্রীসভায়। গত ৪ ফেব্রুয়ারি রবিবার মন্ত্রীসভার অনুমোদন পাওয়ার পর ৫ ফেব্রুয়ারি সেই বিল বিধানসভায় পেশ করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামি। পরে বিলটি বিধানসভায় পাশ হয়।

কমিটি যে রিপোর্ট জমা দেয়, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯২ পৃষ্ঠার এই খসড়া বিল তৈরি করে হিমালয়ের কোলে অবস্থিত রাজ্যের উত্তরাখণ্ড সরকার। বিলটির নাম— The Uniform Civil Code of Uttarakhand, 2024। বিলটির মূলত চারটি দিক রয়েছে--- (১) বিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ, (২) উত্তরাধিকার, (৩) লিভ ইন সম্পর্ক এবং (৪) এগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ (Miscellaneous)। বিলে রয়েছে মোট ৩৯২টি ধারা এবং ৭টি তফশিল। তবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিলের বিধান উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য নয়।

বিলের ২ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে— Nothing contained in this Code shall apply to the members of any Scheduled Tribes within the meaning of clause (25) of Article 366 read with Article 342 of the Constitution of India and the persons and group of persons whose customary rights are protected under Part XXI of the Constitution of India.

ওই বিলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক সংক্ষেপে এই স্বল্প পরিসরে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে—

১. **বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত প্রস্তাব :** ধর্ম নির্বিশেষে মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর করা হয়েছে। সেই সঙ্গে 'রেজিস্ট্রি বিবাহ' বাধ্যতামূলকের কথা বলা হয়েছে এই বিলে। বিবাহ নথিভুক্তকরণ না করলে সরকারি সুবিধা মিলবে না। মেয়েদের বিবাহের বয়স বৃদ্ধির পিছনে যুক্তি হচ্ছে বিয়ের আগে মেয়েরা শিক্ষা অর্জনের পর্যাপ্ত সময় ও সুবিধা পাবে। বিবাহবিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর মুসলমান মহিলাদের যে নিকাহ হালালার সম্মুখীন হতে হয় এবং তারা যে ইদ্দত করেন, তা নিষিদ্ধ করার চেষ্টা। মুসলমান মহিলা-সহ সমস্ত মহিলাকে দত্তক গ্রহণের অধিকার প্রদান করা। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ। বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও উত্তরাখণ্ড রাজ্যে সকলের জন্য একই নিয়ম বলবৎ করার কথা বলা হয়েছে এই বিলে। দম্পতিকে নির্দিষ্ট সময় 'কুলিং অফ্' পিরিয়ডে থাকতে হবে।

২. **বহু বিবাহ রোধে প্রস্তাব :** অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংক্রান্ত বিলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বহু বিবাহ। যে কোনও ধর্মের মানুষের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম বলবৎ হবে। নিয়ম ভাঙলেই কঠোর শাস্তি।

৩. **লিভ-ইন সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব :** কোনও যুগল 'লিভ-ইন' করতে চাইলে প্রথমেই তাঁদের নাম পুলিশের কাছে নথিভুক্ত করতে হবে। 'লিভ-ইন' সম্পর্কের 'ঘোষণাপত্র' সঙ্গে রাখতে হবে যুগলকে। বিলে বলা হয়েছে যে, উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা হোক বা না হোক, ধারা ৩৮১-এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে লিভ-ইন সম্পর্কের একটি বিবৃতি রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দিতে হবে। যেসব দম্পতি এক মাসেরও বেশি সময় ধরে লিভ-ইন সম্পর্কে রয়েছেন অথচ বিবৃতি জমা দেননি, তাঁদের জন্য তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়ই শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সময় মতো প্রয়োজনে তা দেখাতে ব্যর্থ হলে যুগলের ২৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং ছ' মাসের জেল হতে পারে। কেউ যদি 'লিভ-ইন' সম্পর্ক নথিভুক্ত করতে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন তবে সর্বোচ্চ ছ' মাসের জেল বা ২৫ হাজার টাকা জরিমানা কিংবা উভয়ই হতে পারে। 'লিভ-ইন' সম্পর্কে থাকাতে যুগলের যদি সন্তান হয়, তবে শিশু আইনি স্বীকৃতি পাবে। ২১ বছরের কম বয়সিদের লিভ ইনের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের সম্মতি বাধ্যতামুলক। কোনও সঙ্গী বিবাহিত হলে বা অন্য সম্পর্কে জড়িত থাকলে, নাবালক বা নাবালিকা হলে এবং জোর করে ব প্রতারণা করে সম্মতি আদায় করা হলে অথবা ভুল পরিচয় দিলে, লিভ-ইন সম্পর্ক নথিভুক্ত হবে না। লিভ-ইন সম্পর্কের ইতি টানতেও উভয়ের বিবৃতি জমা করতে হবে।

৪. **উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাব :** সকল ধর্মের পুত্র ও কন্যার সমান অধিকার। বৈধ ও অবৈধ সন্তানের সমান অধিকার। দত্তক নেওয়া এবং জৈবিকভাবে জন্ম নেওয়া সন্তানদের সমান অধিকার। কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তিতে স্ত্রী, সন্তান এবং বাবা-মায়ের সমান অধিকার।

পরিশেষে বলা যায়, ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতিটি লোকসভা ভোটেই বিজেপির নির্বাচনী সংকল্পপত্রে রয়েছে তিনটি ঘোষিত প্রতিশ্রুতি— রামমন্দির, ৩৭০ অনুচ্ছেদের অবলুপ্তি এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। তালিকার দুটি প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই কার্যকর করে ফেলেছে বিজেপি। বাকি রয়েছে তৃতীয়টি। বর্তমানে দেশে একমাত্র গোয়ায় পর্তুগিজ শাসন থেকে চালু রয়েছে এই সংক্রান্ত আইন। স্বাধীনতার পর উত্তরাখণ্ডই প্রথম রাজ্য হবে, যেখানে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হবে। গত কয়েক বছরে সংসদে প্রাইভেট মেম্বার বিলও এনেছেন একাধিক বিজেপি এমপি। এই সবই প্রতিক্রিয়া যাচাইয়ের কৌশল। পাশাপাশি সমাজকে বার্তা দেওয়া, আজ না হয় কাল সরকারিভাবে এই বিল আসছেই। অভিন্ন দেওয়ানি বিল নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব, আইনমন্ত্রক এবং বিশেষজ্ঞরা আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। ২০২৪-এ কেন্দ্রে মোদী সরকার বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে ক্ষমতায় এলে তা গোটা দেশে বলবৎ করা হতে পারে। সমগ্র দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লালু শুধু সময়ের অপেক্ষা বল চলে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

অর্ধসত্য মিথ্যাকেও হার মানায় : সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন যেন আমি সত্যের অপলাপ করি

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুভাষ বসু প্ল্যানিং কমিশন করেছিলেন। মোদী তা তুলে দিয়ে নীতি আয়োগ করেছেন। ঘটনা হলো সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের ১৪ জন বাঙ্গালি সভাপতির মধ্যে শেষ সভাপতি। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হন। পরের বছর আবার ত্রিপুরি কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হওয়াতে গান্ধী মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়া পরাজিত হন। গান্ধীর বিখ্যাত উক্তি, 'পট্টভির পরাজয় মানে আমার পরাজয়।' সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৮ সালে জওহললালকে সভাপতি করে প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেছিলেন। স্বাধীনতার আগে এমনকী স্বাধীনতার পরে জওহরলাল নেহরু তার রিপোর্ট জমা করেননি। ১৯৫০ সালে নেহরু সোভিয়েত আদলে প্ল্যানিং কমিশন গঠন করেন এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু করেন। ইতিপূর্বে ১৯২৮ সালে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা ও কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে Gosplan (Soviet State Planing Commision) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গঠন করেন ১৯২৮— ১৯৩২ সালে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে কথা বললেন না, সুভাষ বসু ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেও ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে অসমর্থ হন এবং কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। অব্যবহতি পরে, কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে সারা দেশে সভা করতে শুরু করেন। ফলস্বরূপ সুভাষ বসু কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন। পরবর্তী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা বিহারের রামগড়ে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ সভাপতি নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্র বসুকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে বঙ্গপ্রদেশের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত হননি। সত্য জানলে মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেস করতেন না কিংবা কংগ্রেসের নাম যুক্ত করে তৃণমূল কংগ্রেস নামে কোনো দল গঠন করতেন না। যদি তাঁর সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থেকে থাকে।

২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নীতি আয়োগ ঘোষণা করেন। NITI Aayog (National Institution for Transforming India) যার ভিত্তি, Knowledge (জ্ঞান), Innovation (উদ্ভাবন) ও Entnepreneship (উদ্যোগ)। দ্বিতীয় অসত্য মমতা ব্যানার্জি বললেন পশ্চিমবঙ্গের ১.৯৫ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে সিএজি প্রতিবেদন সম্পর্কে। সংবিধানের ১৪৮ থেকে ১৫১ অনুচ্ছেদে সিএজি (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল) নিয়োগ ও প্রতিবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত বলা আছে। রাষ্ট্রপতি সিএজি-কে নিয়োগপত্র দেবেন। সিএজি নিরপেক্ষ ব্যক্তি এবং তাঁর প্রতিবেদনও নিরপেক্ষ (Independent)। তাঁর মর্যাদা ক্যাবিনেট মিনিস্টারের সমান যদিও তিনি লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য নন। সংসদের উভয়কক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি যে প্রতিবেদন পেশ করবেন তার সম্পর্কে সরকার বা বিরোধী পক্ষ সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন না। কেন্দ্রের সিএজি রিপোর্ট রাষ্ট্রপতিকে এবং রাজ্যের সিএজি রিপোর্ট রাজ্যপালকে জমা করতে হয়।

প্রথমত, সিএজি রিপোর্ট ২০২১ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে জমা পড়েছে। ২০২৩ অর্থবর্ষ পর্যন্ত নয়! ২০২১-এ সিএজি রিপোর্টে বিস্তর অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। প্রায় ১.৯৫ লক্ষ কোটি টাকার অসঙ্গতির মধ্যে মূল তিনটি ক্ষেত্র— নগর উন্নয়ন, স্কুল শিক্ষা ও পঞ্চায়েত। কেবলমাত্র পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ৮১,৮৩৯ কোটি টাকা, স্কুল শিক্ষায় ৩০,৮৫০ কোটি টাকা এবং নগর উন্নয়ন ও পৌর সংক্রান্ত বিষয়ে ৩০,৬৯৩ কোটি টাকার দুর্নীতি সিএজি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সিএজি রিপোর্ট পেশের আগে পবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটিতে আলোচনা হয়। যেখানে সরকার ও বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, বিরোধী দল থেকে পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাও মানা হয়নি। মনরেগা ২৭ ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ বার বার ইউ এস (ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট) দিতে ব্যর্থ হয়েছে কিংবা প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হয়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ ২০২১ পর্যন্ত অর্থ পেয়েছে, তারপর অর্থপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলি ভয়ংকরভাবে দেখা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর সংবিধানের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা থাকলে সিএজি রিপোর্ট নিয়ে অযাচিত মন্তব্য করতে পারতেন না। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ও সংবিধানের প্রতি প্রশ্ন তোলার শামিল। সেই অর্থে Constiuent Assembly ও সংবিধান প্রণেতাদের প্রতি প্রশ্ন তোলা হয়, যা কোনোভাবেই অভিপ্রেত নয়। আর এক মিথ্যার বেসাতি শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অযোধ্যায় ২২ জানুয়ারি, ২০২৪ রামলালার মূর্তি প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর তিনি হিন্দুর থেকেও বেশি হিন্দু হবার চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন মন্দিরে অর্থসাহায্য বা জমি দানের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন। এই প্রসঙ্গে মায়াপুরের ইসকনকে ৭৫০ একর জমিদানের কথাও বলতে শুরু করেছেন। প্রকৃত সত্য হলো মায়াপুর ইসকন মন্দিরসংলগ্ন বৈদিক ভিলেজের জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষের ২৪ একর জমি ছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষের অর্থ থাকা সত্ত্বেও West Bengal Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 থাকার কারণে কৃষি বা অকৃষি জমি ২৮.৭ একরের বেশি অধিগ্রহণের বাধা ছিল। রাজ্যের শাসকদল এই আইনের সংশোধন করে সেই উর্ধ্বসীমা তুলে দেয়। West Bengal Land Reforms Amendment Act, 2023 অনুসারে জমি উর্ধ্বসীমা তুলে দেওয়াতে ইস্কন মন্দির কর্তৃপক্ষ ৭২০ একর জমি বৈদিক ভিলেজের জন্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় নিজেদের সংগৃহীত অর্থ থেকে। রাজ্য কোনো অর্থ দেয়নি। রাজ্য রেজিস্ট্রেশন ফি মুকুব করেছে মাত্র।

সত্যেরে লও সহজে। সত্যের থেকে পবিত্র কিছু নেই, আর অনৃত থেকে ঘৃণ্য কিছু নেই। □

ভারত সরকারের জলপথ পরিবহণ যোজনা

শেখর সেনগুপ্ত

আমাদের দেশ ভারতবর্ষে সড়কপথে যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যাদির পরিবহণ চলে প্রতিদিন, তার একটা হিসেব তৈরি করতে গেলে মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। সেই হিসেব ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে বিশ্বের অধিকাংশ দেশকে। সড়ক নেটওয়ার্কে তাই ভারত এই মুহূর্তে বিশ্বে দ্বিতীয়। হয়তো অচিরে প্রথম স্থানটিই অধিকার করে নিতে পারে। এর জন্য এ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের গর্বানুভব করবার অবকাশ রয়েছে। এই ব্যাপ্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে সম্প্রতি আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্মরণ করিয়ে দিলেন এই ভাষায়, 'এ দেশের সর্বত্র বিস্তারিত যে কর্মযজ্ঞ, তার পশ্চাতে রয়েছে আমাদের পরিবহণ

ব্যবস্থা, যা চলে যুগপৎ স্থলে ও জলে। আমি বলছি এবং আপনারাও জানেন যে, কেবল সড়কগুলির দৈর্ঘ্য, পরিচ্ছন্নতা, সুগম্যতা এবং ইন্টারমিডিয়েট লেনগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটালেই আমরা সম্পূর্ণ সমস্যামুক্ত হবো না; আমাদের আরও সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে পথদুর্ঘটনার সংখ্যাকে কমিয়ে কমিয়ে একেবারে তলানিতে নিয়ে আসতে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের এমত শপথ, হুঁশিয়ারি, নিয়ত সতর্কতাবাণী উচ্চারণ এবং তড়িৎ ব্যবস্থাগ্রহণের সুবাদে তমাম ভারতে পথদুর্ঘটনার সংখ্যা বিগত মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং পথদুর্ঘটনার দরুণ মৃত্যুর সংখ্যাও কমেছে পঞ্চাশ শতাংশ। এর জন্য বর্তমান সরকার কৃতিত্বের দাবি করতেই পারেন। এবার চলে যাচ্ছি কিছুটা অন্য প্রসঙ্গে। দুর্ঘটনা তো কেবল স্থলেই হয় না, জলেও হয়। ইতিহাসের পাতা ওলটালে আছে জাহাজডুবির বিস্তর ঘটনার বৃত্তান্ত। কেবল জলযুদ্ধ নয়, প্রাকৃতিক হিংস্রতায় যাত্রীসমেত ডুবে গেছে আজ অবধি কত জলযান! একথা অনস্বীকার্য যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ত হুঁশিয়ারি এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুবাদে আমাদের দেশে সড়কদুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বিগত এক দশকে পঞ্চাশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। নাগরিকদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে গত এক দশক ধরে সরকারি প্রয়াস যে কতখানি সফল, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। স্থলে চলাফেরায় যে নিরাপত্তা, জলে তার অবস্থিতি কতটা, সেটাও অনুধাবন করা দরকার। এক বন্দর থেকে অন্য এক বন্দর অবধি জাহাজে জাহাজে পরিবহণব্যবস্থা যুগপৎ অন্তর্দেশে ও বহির্দেশে আমরা কতটা বাড়াতে পেরেছি, তাও রাখতে হবে হিসেবের আওতায়।

এই বিষয় নিয়ে চর্চা চালিয়ে আমি যে সকল নিদর্শন তথ্যাদি সমেত অবহিত হলাম, আমার নিজের কাছেও তা অবশ্যই মূল্যবান। ১৯৯৮ সালে, যখন আমি দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্টাফ কলেজের ফ্যাকালটি, বিষয়টিকে নিয়ে চর্চায় বসে যাই এবং ক্রমে জ্ঞাত হলাম যে, ভারতবর্ষে মোট পরিবহণের মাত্র ৬ শতাংশ বহন করে থাকে দেশের হরেক উপকূলীয় এবং অন্তর্দেশীয় জলযানগুলি। কিন্তু আজ অর্থাৎ এই ২০২৪ সনের প্রথম মাসেই সেই পরিবহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ অর্থাৎ ১২ শতাংশেরও কিঞ্চিৎ অধিক। এর জন্য ভারত সরকারকে সমুদ্রের এবং গুটিকয়েক বৃহৎ নদ-নদীর গভীরতাকে বাড়াতে হয়েছে অতলান্তেই খননকার্য চালিয়ে, যদিও এই বিষয়টিকে নিয়ে সরকারি অথবা বেসরকারি প্রচারমাধ্যম আজ অবধি তেমন একটা সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। মনে রাখা দরকার— ভারতের উপকূলীয় দৈর্ঘ্য হলো ৭৫০৯ কিলোমিটার। এই বিপুল দৈর্ঘ্য আমাদের দেশকে বিশ্বের প্রথম তিনটি উপদ্বীপের অন্যতম করে রেখেছে। কেবল তাই নয়, ইত্যাকার বৃহৎ উপকূল জুড়ে গড়ে উঠেছে ২১৭টি বড়ো, মাঝারি ও ছোটো বন্দর। এই বন্দরগুলির একটা বড়ো অংশ বর্তমান সরকারের আমলে অনেক বেশি সুগঠিত এবং সুরক্ষিত হয়েছে; প্রতিটি বন্দরে রেল চলাচলের ব্যবস্থা গড়ে তুলছে বিজেপি শাসিত সরকারের দ্বারা লালিত পালিত সাগরমালা প্রকল্পের অধীন 'ইন্ডিয়ান পোর্টরেল অ্যান্ড রোপওয়ে কর্পোরেশন লিমিটেড'। যদিও এই কৃতিত্ব নিয়ে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত সরকার খুব একটা ঢাক পেটাননি আজ অবধি। আমিই এই সম্পর্কে অবহিত হই বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক বিবরণী থেকে পাঠ করবার পর।

অতঃপর পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে যা বিশেষ প্রয়োজন তা হলো অন্তর্দেশীয় জলপথে বিচরণ উপযোগী জলযানের সংখ্যায় বৃদ্ধি ঘটানো। দরকার মাল্টিমোডাল এবং ইন্টারমোডাল যোগাযোগের ব্যবস্থাপনার পরিধির আরও বৃদ্ধি ঘটানো। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। কাজ কিন্তু চলছে প্রায় নীরবে।

তথ্যসূত্র :

১. National Transport Development Policy Committee Report, 2023. ২. Budget Document, 2023. ৩. আগামী প্রজন্মের জন্য পরিকাঠামো বিকাশ—কৃষ্ণা দেব।

এদেশের সভ্যতা সংস্কৃতি বিনষ্ট করার নতুন ষড়যন্ত্র

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

বাঙ্গালি যদিও-বা সেই হিন্দুধর্ম বিরোধী বামপন্থার হাত থেকে কোনোক্রমে নিষ্কৃতি পেল, কিন্তু আরেক দিক থেকে শুরু হলো নতুন চক্রান্ত। এদেশের সভ্যতা সংস্কৃতি বিনষ্ট করার নতুন ষড়যন্ত্র। গত ১৫/২০ বছর ধরে প্রেমের মতো এক পবিত্র সম্পর্ককে নিয়ে শুরু হয়েছে এক রুচিহীন অশ্লীল চর্চা— 'ভ্যালেন্টাই ডে' পালন। ভালোবাসার জন্য আবার নতুন কোনো দিন হয় নাকি? ৩৬৫ দিনই তো ভালোবাসার দিন। ভালোবাসায় প্রেমিকের স্থান হৃদয়ে, তা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সবসময় প্রবহমান। তার জন্য আবার নতুন দিবস কেন? আমাদের দেশে ভালোবাসার কারণেই ভগবান শ্রীরাম সীতামাকে উদ্ধার করার জন্য রাবণকে সংহার করেছিলেন, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকথা তো যুগযুগান্ত ধরে ইতিহাসে অমর। তবে আমাদের দেশে অবার নতুন করে ভালোবাসা দিবস কেন? আর কেনই-বা তাকে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা?

বিদেশে ভালোবাসা বস্তুটি একটা কনট্রাক্ট মাত্র। সেখানে মনের মিলন নয়, দেহ সুখই মুখ্য। সে দেশে 'লাভ' শব্দটি জৈবিক আনন্দ পাওয়ার একটি মাধ্যম। কিন্তু আমাদের দেশে ভালোবাসা হলো ঈশ্বরের মহত্তম দান। এদেশে প্রেম কথাটির অর্থ সমর্পণ, এক ঐশ্বরিক অনুভূতি। তাই ঈশ্বর-প্রেম ভগবত-প্রেম শব্দের জন্ম এদেশেই। আমাদের প্রেম ততটাই গভীর যতটা আমি আমার প্রিয়জনকে দিতে (সমর্পণ) পারি। অর্থাৎ আমাদের প্রেম কনসেপ্ট হলো দানের। কিন্তু বিদেশে লাভ (প্রেম) শব্দের অর্থ হলো 'গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি'। দেওয়া আর নেওয়ার ওপারেই নির্ভর করে ভালোবাসার গভীরত্ব ও স্থায়িত্ব। তাই সে ভালোবাসায় পাওয়া কামে গেলে প্রেমে ছেদ পড়ে।

এই বিদেশি ভ্যালেন্টাইন ডে'র একটি ইতিহাসও আছে। ২৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইটালির রোমনগরে ভ্যালেন্টাইন নামে এক খ্রিস্টান পাদরি এবং চিকিৎসক ছিলেন। ধর্ম প্রচারের অভিযোগে নয় বরং অনেকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে তৎকালীন রোম সম্রাট দ্বিতীয় ক্রেডিয়াস তাকে বন্দি করেন। রোমান সাম্রাজ্যে তখন খ্রিস্টধর্ম প্রচার তখনও নিষিদ্ধ ছিল। বন্দি অবস্থায় সেই পাদরি জনৈক কারারক্ষীর দৃষ্টিহীন কন্যাকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন এবং সেই অন্ধ মেয়েটির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এই ঘটনা সামনে আসাতে রোম সম্রাট তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ছিল পাদরি ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদণ্ডের দিন। ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ সেন্ট জেলাশিউও ১৪ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণ রাখতে ভ্যালেন্টাইন দিবস ঘোষণা করেন। খ্রিস্টান দুনিয়ায় পাদরিদের স্মরণে রাখতে এরকম অনেক দিবস রয়েছে। সুতরাং অনেকগুলি দিবসের মধ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি এক সাধারণ দিবস মাত্র। এর সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসার কোনো সম্পর্কই নেই।

একবার ভারতের এক প্রতিনিধি দল ইংল্যান্ড সফরে ছিলেন। এক ডিনার পার্টিতে ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিরা ভারতীয় প্রতিনিধিদের সামনে নিজেদের পরিবারের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। একজন বললেন আমি জন স্টুয়ার্ট, ইনি আমার তৃতীয় পত্নী জেরিন। পাশের ভদ্রমহিলা তার সঙ্গীর পরিচয় করালেন এই বলে যে আমি নিলফার, আর ইনি হলেন আমার চতুর্থ স্বামী রবার্ট। এরকম একের পর এক চলতে থাকলো। শেষে এল ভারতের প্রতিনিধিদের পরিচয়ের পালা। ভারতের প্রতিনিধি দলের এক প্রতিনিধি বললেন আমি রাজেন্দ্র কুমার, আর ইনি আমার একমাত্র ধর্মপত্নী দেবযানী। এভাবে একে একে সব ভারতীয় প্রতিনিধি তাদের স্বামী স্ত্রীদের পরিচয় করালেন। এদের দেখে বিদেশি অতিথিরা তো হতবাক! একমাত্র স্ত্রী? এক স্বামী স্ত্রী একে অপরকে নিয়ে সারা জীবন একসঙ্গে কাটাতে পারে নাকি? যাদের দেশে নারী-পুরুষের চারিত্রিক সূচিতা বলে কিছু নেই তাদের কাছে এ তো বিস্ময়কর ঠেকবেই। তাদের কাছে ভালোবাসার অর্থ দৈহিক সুখ। বিবাহ হলো একটি কন্ট্রাক্ট, ভালোবাসার কোনো স্থান নেই। সামান্য মতদ্বৈততা, ব্যক্তিগত ছোটোখাটো ভুল বোঝাবুঝি বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হয়। ডিভোর্স সেখানে জল ভাত। সে দেশে স্ত্রী-পুরুষের জীবনের ৪-৫ বার জীবনসঙ্গিনী পরিবর্তন কোনো ব্যাপারই নয়। বিবাহের থেকে লাভ টুগেদারের মহত্ত্ব বেশি। তাদের দেশে একই নারী-পুরুষ তাদের জীবনে বহুবার সঙ্গী বদল করে। তাই তারা বছরে একদিন তাদের পুরনো সঙ্গীদের স্মরণ করে তাদের শুভেচ্ছা জানাবার যে পন্থা আবিষ্কার করেছে তাই হলো ভ্যালেন্টাইন ডে।

বিপরীতে আমাদের দেশে প্রেম হলো ঈশ্বরের আরেক রূপ। পতি-পত্নীর সম্পর্ক হলো জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন। তাই এদেশে পরিবারের বন্ধন অটুট। প্রেম ভালোবাসা আমাদের দেশে পারিবারিক ব্যবস্থার একমাত্র চাবিকাঠি। পাশ্চাত্যে প্রেম নেই, তাই পরিবারের কনসেপ্টও নেই। ১৮ হলেই পুত্র-কন্যা নিজের রাস্তা দেখে নেয়। পিতা-মাতা পরিবার পরিজনের সঙ্গে আনন্দ করে একসঙ্গে বসবাস করা সে দেশে অলীক কল্পনা। সে দেশে মা-বাবা বৃদ্ধ হলে ওল্ডেজ হোমই তাদের ঠিকানা। সেখানে সোশ্যাল ম্যারেজ বলে কিছু নেই। যুবক-যুবতীরা বিয়ে করে নিজেদের ইচ্ছায়। আগে প্রেম, তারপর লিভ টুগেদার, পরে ইচ্ছা হলে ম্যারেজ, সামান্য মতের অমিলে ডিভোর্স, আবার নতুন সঙ্গীর খোঁজ। আর আমাদের দেশে বিয়ে হলো পরিবারে পরিবারে মিলন। আগে দেখাশোনা, পরিবারক সম্পর্ক, তারপর বিয়ে, তারপর ভালোবাসা। তাই আমাদের দেশে প্রেমের বন্ধন অটুট।

কিন্তু বাঙ্গালি আজ প্রেম ভালোবাসার এই মহান বৈশিষ্ট্য ভুলতে বসেছে। বাজার অর্থনীতি ও খ্রিস্টীয় কালচার তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। এযুগের যুবক-যুবতীরা আজ 'ভ্যালেন্টাইন ডে'র দিনে একদিনের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রেমিক হতে চায়। বিদেশিদের মতো দামি উপহার, সুদৃশ্য গ্রিটিংস আর গোলাপের বোকের মধ্যে সে খুঁজে বেড়ায় প্রেমের ঠিকানা। যেন ওই দামি গিফটের মধ্যেই সব কৃতিত্ব লুকিয়ে আছে। যে যত দামি উপহার দেয় তার ভালোবাসা তত দামি। পাশ্চাত্যের এই অন্ধ অনুকরণ প্রেমের সংজ্ঞাই শুধু পালটে দিচ্ছে না, পালটে দিচ্ছে আমাদের পরিবারের কচিকাঁচাদের শালীনতা বোধও। প্রেমের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে এদিন পথে-ঘাটে পশুদের মতো অশোভনীয় আচরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আমাদের যুবক-যুবতীরা। তারা বুঝতে পারছে না যে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে 'আই লাভ ইউ' বা 'ম্যারি ভ্যালেন্টাইন' বললেই মনের ভালোবাসা বোঝানো যায় না, ভালোবাসা হলো অনুভবের জিনিস, আবেগের জিনিস। প্রেম হলো নিঃশব্দ প্রকাশ। কবির কল্পনায় 'গভীর হয় গো যেখানে ভালোবাসা, মুখে তো সেখানে থাকে না কোনো ভাষা' তার অনুভব। বরং ১৪ ফেব্রুয়ারি আমাদের কাছে এক অন্য প্রেমের বার্তা নিয়ে আসুক। তা হলো মাতৃপ্রেমের বার্তা। এদিন হলো মা সরস্বতীর আরাধনা দিবস। ব্যক্তি জীবনে আমরা মায়ের কাছে যা চাই মা আমাদের তা অকাতরে দান করেন। তাই মা ও সন্তানের মধ্যে ভালোবাসা হলো ঐশ্বরিক ভালোবাসা। ভ্যালেন্টাইন ডে'র জৈবিক আকর্ষণ নয়, মাতৃপ্রেমের স্নেহ-মাধুর্যের প্রকাশ ঘটুক সরস্বতীপূজার দিনটিতে। ◻

ভারতকে নতুন দিশা দেখাল কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী বাজেট

ড. রামানুজ গোস্বামী

পেশ হলো কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী বাজেট। নিঃসন্দেহে এই বাজেট ঐতিহাসিক। এটা ঠিক যে, এই বাজেটে আয়কর কাঠামো মোটের উপর অপরিবর্তিতই রাখা হয়েছে। আসলে মোদী সরকারের সুস্পষ্ট নীতিই হলো ভারত ও ভারতবাসীর যথার্থ বিকাশ। তাই নিছক প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে সস্তা জনপ্রিয়তায় ভোট-বৈতরণী পার হওয়ার নীতিতে মোদী সরকার বিশ্বাস করে না। অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, ভোটের বছর বলেই কর-কাঠামোর বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, অর্থনীতিতে বিশ্বমানচিত্রে ভারতকে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে একেবারে শীর্ষ স্থানে নিয়ে যেতে হলে যে সদর্থক পদক্ষেপ প্রয়োজন, সেগুলিই এবারের বাজেটে গৃহীত হয়েছে। দেশের যুবসমাজ, দরিদ্র, মহিলা ও কৃষকশ্রেণীকে নিঃসন্দেহেই আরও শক্তিশালী করে তুলবে এই বাজেট। ২০৪৭ সালের (দেশের স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি) মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলাই হলো মোদী সরকারের লক্ষ্য। এই বাজেট সেই লক্ষ্যপূরণের কথাই বলেছে।

বিকশিত ভারতের জন্য রাজ্যগুলিকে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো 'লাখপতি দিদি প্রকল্প'। বাজেটে প্রতি বছরে অন্তত ১ লক্ষ টাকা রোজগার করেন এমন মহিলাদের সংখ্যা ৩ কোটিতে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এরই পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আরও ২ কোটি বাড়ি তৈরির কথাও বলা হয়েছে। এই খাতে বরাদ্দও শতকরা ১৮ শতাংশ বেড়েছে। পাশাপাশি সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষরাও যাতে নিজেদের বাড়িতে বসবাস করতে পারেন, তার জন্যও এবারের বাজেটে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।

একথা বলাবাহুল্য যে, পরিকাঠামোর উন্নয়ন যে কোনও দেশের ক্ষেত্রেই কাম্য। উন্নত পরিকাঠামো দেশকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়। বাজেটে এই দিকটিও মোটেই উপেক্ষা করা হয়নি। পরিকাঠামোর উন্নতিতে ১১ লক্ষ ১১ হজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বাজেটে। পাশাপাশি ১ কোটি বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর প্রস্তাবও রয়েছে এবারের বাজেটে। তাছাড়া, প্রতি মাসে ১ কোটি পরিবারকে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। রয়েছে স্টার্ট-আপে কর ছাড়ের ঘোষণাও। কৃষকদের উন্নতির জন্য রয়েছে একগুচ্ছ ঘোষণা। উৎপাদিত ফসল সংরক্ষণ ও ফসলের বাজারীকরণ সম্পর্কিত পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে জোর দেওয়া হয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও তেল উৎপাদনে। এই যে পরিকাঠামো খাতে বিপুল বরাদ্দ, এতে কর্মসংস্থানও হবে। তাছাড়া দেশের যুবসমাজকে আরও সুদক্ষ করে তোলার জন্য স্কিল ইন্ডিয়া মিশন প্রকল্পে জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের চিকিৎসায় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। সর্বক্ষেত্রের পাশাপাশি গবেষণাতেও বেড়েছে বরাদ্দ।

৪০ হাজার রেলের বগিকে বন্দে ভারত পর্যায়ে উন্নীত করা হবে। জোর দেওয়া হচ্ছে যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে। তৈরি হচ্ছে ইকনমিক করিডর। স্বাভাবিক ভাবেই এসবের ফলে অবশ্যই বাড়বে দেশের জাতীয় আয়। এই সবের পাশাপাশি আরও দুটি বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার। প্রথমটি হলো ধর্মীয় পর্যটনের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা আর দ্বিতীয়টি হলো দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উপরে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া যাতে এই রাজ্যগুলিও সমান তালে দেশের অগ্রগতিতে শামিল হতে পারে। ব্যবসাবাণিজ্য তথা নানাবিধ উপায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ যে ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানগুলিতে হতে পারে এবং এর ফলে যে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যেতে পারে, তার প্রমাণ অযোধ্যার ভব্য রামমন্দিরের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই তীর্থস্থান বা তীর্থক্ষেত্র শুধুমাত্র যে ধর্মীয় চেতনার জাগরণ ঘটায় তা নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নেও তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই যারা অর্থনীতিতে মন্দিরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, বস্তুত, সেই ব্যক্তিরা আসলে অর্থনীতির এক স্বাভাবিক ক্ষেত্রকেই অস্বীকার করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু পূর্ব ভারতের রাজ্য, তাই আগামীদিনে এই রাজ্যের উপরে কেন্দ্র সরকার যে সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে সেটা তো বলাই বাহুল্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সেই সুযোগ কাজে লাগতে পারবে কী না, তা নির্ভর করছে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার উপরে। অহেতুক ও অযৌক্তিক কেন্দ্র বিরোধিতা, ভয়াবহ দুর্নীতি এবং সীমাহীন সংখ্যালঘু তোষণ পশ্চিমবঙ্গকে খাদের কিনারায় নিয়ে এসেছে।

এককথায় এটাই বলা যেতে পারে যে, এই বাজেট একেবারেই বাস্তবসম্মত ও যুক্তিনিষ্ঠ বাজেট। এতে কোনও অলীক কল্পনা তথা আকাশকুসুম প্রতিশ্রুতি একেবারেই নেই। তাতে যা আছে তা হলো একটা সুনির্দিষ্ট নীতি যা অতিদ্রুত ভারতকে বিশ্বের প্রধান চালিকাশক্তি করে তুলবে। স্পষ্ট ভাবেই এই কথা বলা যেতে পারে যে, এবারের বাজেট সবরকম বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের সমস্ত শ্রেণীর সামগ্রিক উন্নয়নের মডেলকেই তুলে ধরেছে। বিরোধীদের অবান্তর বিরোধিতা, স্বার্থান্বেষী 'টুকরে টুকরে গ্যাং' এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত গণমাধ্যমগুলির কুৎসিত অপপ্রচারকে স্রেফ ভোঁতা করে দিয়ে এই বাজেট প্রমাণ করে দিল যে, সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলাই মোদী সরকারের লক্ষ্য।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গবেষক)

এই বাজেট বাস্তবসম্মত ও যুক্তিনিষ্ঠ বাজেট। এতে কোনও অলীক কল্পনা তথা আকাশকুসুম প্রতিশ্রুতি নেই। যা আছে তা হলো একটা সুনির্দিষ্ট নীতি যা অতিদ্রুত ভারতকে বিশ্বের প্রধান চালিকাশক্তি করে তুলবে।

বঙ্গভূমিতে মাতৃশক্তির জাগরণ

গত ৬-৮ ফেব্রুয়ারি, বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালির ত্রিমোহিনী, কাহারপাড়া, দাশপাড়া, সন্দেশখালি বাজার, পাত্রপাড়ার মতো গ্রামগুলিতে সন্ত্রাসবাদী খলনায়ক শেখ শাজাহানের দুষ্কৃতী শাগরেদ, রাজ্যের শাসক দলের কুখ্যাত নেতা উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের ভয়ংকর শাসন, হিংস্রতা ও প্রবল অত্যাচারের বিরুদ্ধে সার্বিক প্রতিরোধে শামিল অত্যাচারিত হিন্দু ও জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রান্তিক জনতার মরণপণ অবরোধের সাক্ষী থাকলো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, যার নেতৃত্বদান করলেন স্থানীয় মাতৃশক্তি। সাম্প্রতিক অতীতে একাধিক হিন্দুকে হত্যা, জাতীয়তাবাদী শক্তির গলা চেপে ধরা জেহাদি রাজনীতিক এবং তার পদলেহী কিছু চরিত্রহীন, আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের পাপের ঘরা অনেক আগেই উপচে গিয়েছে। গায়ের জোরে, ভয় দেখিয়ে জনজাতি সম্প্রদায়ের চাষের জমি দখল, নারীধর্ষণ, বেআইনি ইটভাটা, চায়ের জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে পতিত জমিতে রূপান্তরিত করে সেখানে ভেড়ির রমরমা ব্যবসা, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গোরু, অস্ত্র, মাদক দ্রব্য ও সোনার অবৈধ পাচার ও কারবার, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের বসতি স্থাপন করে শাসক দলের ভোটব্যাংক মজবুত করা থেকে জেলাগুলির ডেমোগ্রাফি পালটে দেওয়া, প্রতিটি নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা— গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে এই নারকীয় শাসনের সম্মুখীন হয়েছে স্থানীয় হিন্দু ও জনজাতি সম্প্রদায়, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় যা 'সোশ্যাল ওয়ার্ক'! রাজ্যের মহিলাদের এক একটি ভোট ৫০০-১০০০ টাকার বিনিময়ে কিনে নেওয়ার প্রচেষ্টারত, জেহাদি মদতপুষ্ট এই শাসক দলের বিরুদ্ধে স্থানীয় বীরাঙ্গনাদের নেতৃত্বে এই গণপ্রতিরোধ, তাদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে শাসক ডাকাতদের রায়মঙ্গল নদীতে ঝাঁপ, দুষ্কৃতী নেতাদের বাঁচাতে দলদাস পুলিশ-প্রশাসনের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ, দুষ্কৃতীদের থানায় নিয়ে গিয়ে নিরাপত্তা দান, নরখাদকদের বিরুদ্ধে মহিলাদের মিছিল ও অবরোধে ব্যাপকভাবে বাধা দান, এমনকী ৫ জানুয়ারির ঘটনার পরেও এখনও পর্যন্ত শেখ শাজাহানের গ্রেপ্তার না হওয়া— আজ প্রমাণ দিচ্ছে বঙ্গভূমির মাতৃশক্তির জাগরণের। যে জাগরণ আগামীদিনে সূচিত করবে সদর্থক পট পরিবর্তনের। এই আশা, এই বিশ্বাসের জ্বলন্ত প্রমাণ এই খুনি, দানবদের বিরুদ্ধে সন্দেশখালির এই সার্বিক প্রতিরোধ।

অজয় কুমার নাথ,
বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা।

অস্ট্রেলিয়ায় গীতা হাতে শপথ

হিন্দু সংস্কৃতির বিশ্বসঞ্চার ঘটে চলছে। আবুধাবিতে তৈরি হলো মন্দির। অস্ট্রেলিয়ার সংসদে গীতা হাতে হলো শপথ গ্রহণ। সারা বিশ্ব আজ হিন্দুত্বকে স্বীকার করে নিচ্ছে। ইংল্যান্ডে আজ ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী। দুঃখের বিষয়, ভারতের রাষ্ট্রবিরোধীরা শুধু হিন্দুত্বকে স্বীকার করছেন না। ভারতীয় সংস্কৃতির কথায় এদের গাত্রদাহ শুরু হয়। গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে সারা বিশ্ব উদ্বেল হয়েছিল। শুধু কটাক্ষ করেছে ভারতের রাষ্ট্রবিরোধীরা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পথে নেমে বিরোধিতা করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার সংসদে গীতা হাতে শপথ নিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংসদ বরুণ ঘোষ, তাতে তাঁদের দেশের কেউ কটাক্ষ করেননি, বরং স্বাগত জানিয়েছেন তাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ। ভারতের রাষ্ট্রবিরোধীরা কি এটি দেখে-শুনে শিক্ষা গ্রহণ করবেন?

—স্নেহাংশু মজুমদার,
দমদম, কলকাতা।

অভিনন্দন পুষ্কর সিংহ ধামিকে

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামিকে অভিনন্দন। উত্তরাখণ্ডই দেশে প্রথম রাজ্য যে প্রথম অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পেশ করেছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। তিনি ভারতে এক দেশ, এক বিধান ও এক নিশানের দাবি তুলেছিলেন। দেশে বিজেপি শাসিত সমস্ত রাজ্যে এই বিধি লাগু করা প্রয়োজন। এখনো তারা দেরি করছে কেন? দেশের মানুষ তাই চায়। অবিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে হবে, নচেৎ মানুষ তাদের ছুঁড়ে ফেলবে। দেশ জেগেছে, দেশের মানুষ জেগেছে।

—সুজন সাহা,
রাঘবপুর মোড়, পুরুলিয়া।

কংগ্রেসের ভ্রান্তি মোচনেই হিন্দুত্বের জাগরণ

সম্প্রতি কর্ণাটকে হনুমান পতাকা অপসারণে, ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। বিজেপি ও জেডি (এস) কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পতাকাদণ্ডটি কেড়াগোড়ু এবং প্রতিবেশী ১২টি গ্রামে বাসিন্দাদের অর্থায়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি নিয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু ওই দণ্ডে হনুমান পতাকা স্থাপনের অনুমতি দেয়নি পঞ্চায়েত। পতাকা অপসারণ করতে গেলে গ্রামবাসীরা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বিজেপি, বজরংদল ও জেটি (এস) সদস্যরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দেন।

স্থানীয় হিন্দুদের ক্ষোভ, কর্ণাটকে এহেন হিন্দু বিরোধী, ধর্মবিরোধী সরকার নির্বাচন এক পরম পরিতাপের বিষয়। কংগ্রেসের এই হিন্দু বিরোধী কর্মকাণ্ড ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের Divide and Rule নীতির ফল। সাম্প্রদায়িক হিংসার মনোবৃত্তি গ্রহণ করেছে কংগ্রেস ব্রিটিশদের থেকে। সে বেদনদীর্ণ ইতিহাস আজও আমাদের কুরে কুরে খায়। উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য দেখে ভয় পেয়ে ইংরেজ Divide and Rule নীতি গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ রদে বাংলার মাটি

ফঃ ৩

বাংলার জল--- গান রচনাই শুধু নয় আন্দোলনের পথে নেমেছিলেন। সে সময় বঙ্গপ্রদেশের গভর্নর ছিলেন কার্জন সাহেব। রবীন্দ্রনাথের পরাক্রম তার মনে হিংসার সৃষ্টি করে। আনন্দের বিষয়, কংগ্রেসের মোহ কাটিয়ে উঠেছে মানুষ। আর তাতেই হিন্দুত্বের জাগরণ ঘটেছে।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, রাশিডাঙ্গা,
কোচবিহার।

দুর্ভাগ্য !

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী যখন কাশ্মীর অভিযান শুরু করেন তখন অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সফর সঙ্গী। তিনি ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পার্সোনাল সেক্রেটারি। কী পরিস্থিতিতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তার সবটাই অটলবিহারী বাজপেয়ী চোখের সামনেই ঘটেছিল। পরে অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন তিনি অন্তত একটা তদন্ত কমিশন গঠন করতে পারতেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে। কিন্তু তিনি তা করার প্রয়োজন মনে করেননি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কংপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

সাহসী অন্তর্বর্তী বাজেট

শ্রীরামের নামে শপথ নিয়ে গত ১ ফেব্রুয়ারি, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সংসদে চমকহীন, দান খয়রাতি শূন্য, চালাকিযুক্ত মিথ্যা প্রতিশ্রুতি না দিয়ে ২০২৪-২৫ বর্ষের আগামী তিন মাসের অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করলেন এবং ইঙ্গিত দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে আগামী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে কারা কেন্দ্রের মসনদে বসতে চলেছে।

গত অর্থবর্ষে (২৩-২৪) কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটের মাধ্যমে যে বিকশিত ভারত, সশক্ত ভারত, তরুণ, মহিলা, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের উন্নতির দিশা দেখিয়েছিলেন তাকেই অনুসরণ করে এই অন্তর্বর্তী বাজেট। দেশকে দেউলিয়া করে কোনো নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য নয়।

বাজেটে উল্লেখযোগ্য ঘোষণাগুলির মধ্যে রয়েছে, এক কোটি বাড়িতে সৌর বিদ্যুৎ, আবাস যোজনায় আরও দু'কোটি বাড়ি তৈরি। তিন কোটি 'লাখপতি দিদি' বানানো। আককর কাঠামো অপরিবর্তীত রেখে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে বড়ো কোনো ছাড় না দিয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৫.৯ শতাংশের পরিবর্তে আর্থিক ঘাটতি জিডিপির ৫.৮ শতাংশ হবে এবং আগামী বছর তা এসে ৫.১ শতাংশে দাঁড়াবে এবং পরবর্তী বর্ষে অর্থাৎ ২০২৫-২৬ বর্ষে ৪.৫ শতাংশে পৌঁছবে, যা আগামী কয়েক বছরে রাজকোষ ঘাটতিকে জিডিপির শূন্য শতাংশে আনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ইঙ্গিত।

রেলের ৪০ হাজার সাধারণ কামরাকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতো করা হবে। প্রধানমন্ত্রী কৃষি যোজনায় ১০ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। আশা এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের চিকিৎসায় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা হলো। সার্ভাইকাল ক্যানসারের টিকা দেওয়া হবে ৯-১৪ বছরের মেয়েদের। ১ কোটি বাড়ির ছাদে সৌর প্যানেল বসানো হবে। প্রতিমাসে ১ কোটি পরিবারকে ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হবে।

—**সঞ্জয় মুখার্জি,**
হাওড়া-২।

সেদিনের নোয়াখালি আজকের সন্দেশখালি

ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন বাবাসাহেব আম্বেদকর। তিনি ছিলেন তপশিলি সমাজের প্রতিনিধি। স্বাধীনতার অমৃত কালখণ্ডে ভারতবর্ষ পেয়েছে প্রথম তপশিলি জনজাতি সমাজ থেকে উঠে আসা মহিলা রাষ্ট্রপতি। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণমেরু স্পর্শ করার যে অহংকার অর্জন করেছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো, সেই (চন্দ্রযান-৩) মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৫৪ জন মহিলা বিজ্ঞানী। দেশের গণতন্ত্র দিবসের ৭৫ বছরের ইতিহাসে নয়াদিল্লির কর্তব্যপথে কুচকাওয়াজে দেশের নানা প্রান্তের নানা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নজর কেড়েছেন ১১২ জন মহিলা শিল্পী, বিএসএফের ৩ অফিসার-সহ ১৪৪ জনের মহিলা সশস্ত্র বাহিনী। শুধু স্থপথে নয়, ককপিটে বসে আকাশ কাঁপিয়ে বায়ুসেনার একের পর এক বিমান উড়িয়েছেন ১৫ জন মহিলা পাইলট। অর্থাৎ স্থল, বায়ু, সমুদ্র, সাইবার দুনিয়া এবং মহাকাশে 'বিকশিত ভারত'কে রক্ষাকবচ গড়ে দিচ্ছেন মেয়েরা'। দেশের প্রথম পূর্ণকালীন মহিলা অর্থমন্ত্রীর (নির্মলা সীতারমন) হাত ধরে ভারতবর্ষ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশের মর্যাদা পেয়েছে।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম, বর্তমানে দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর শাসনকালে এ রাজ্যের তপশিলি জাতি/জনজাতি কন্যাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়ে চলেছে। ভাবলে গায়ে শিহরণ জাগে, যে সমাজের প্রতিনিধি ভারতের মতো বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধান দিয়েছেন, আজ সেই সমাজের মহিলাদের সাংবিধানিক অধিকার তো হরণ হয়েছে, সঙ্গে বছরের পর বছর তাঁরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ইসলামি শাসনের অন্ধকার যুগকে স্মরণ করিয়ে শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের উত্তরসূরিরা তাঁদের যৌনদাসী বানিয়েছে।

তার পরেও এ রাজ্যের তথাকথিত সুশীল সমাজ মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন। কিন্তু আমরা কি আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি? সন্দেশখালির নির্যাতিতা মায়েদের কণ্ঠস্বর হয়ে কি আমরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিবাদ, প্রতিরোধ করতে পারি না? আমাদের ভুলে গেলে চলবে না সেদিনের নোয়াখালি, আজকের সন্দেশখালি। সতর্ক হোন।

—**সৈকত মণ্ডল,**
সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

কয়েকটি বিপজ্জনক ভাইরাস

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সম্প্রতি নিপা ভাইরাসের কারণে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এমনিতে ট্রপিকাল জলবায়ুর দেশগুলিতো ভাইরাস ব্যাকটিরিয়ার বাড়বাড়ন্তের একেবারে উপযুক্ত পরিবেশ। তাই ভারতবর্ষে ভাইরাসঘটিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। মাঝে মধ্যেই H1N1 ভাইরাস বা ফ্লু ভাইরাসের আক্রমণের কথা শোনা যায়। এই পর্বে কয়েকটি বিপজ্জনক ভাইরাস নিয়ে রইল আলোচনা।

জিকা

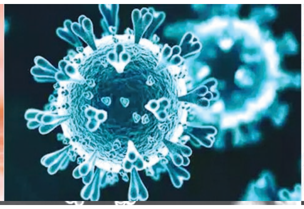

নিপা

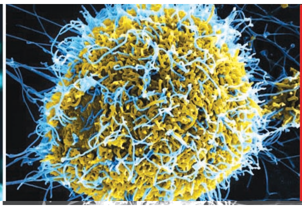

ইবোলা

বার্ড ফ্লু

নিপা ভাইরাস (এনআইভি)

এই ভাইরাসটি মানুষ ও জীবজন্তু উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক। বাদুড় এই ভাইরাসের বাহক। ১৯৯৮ সালে মালয়েশিয়াতে এই ভাইরাসের প্রথম প্রকোপ দেখা যায়। এই সময় শুয়োরকে বাহক হিসেবে দেখা গিয়েছিল। মালয়েশিয়া সরকার রোগ প্রতিরোধ করতে কয়েক লক্ষ শুয়োর হত্যা করেছিল। ২০০৪ সালে এরপর বাংলাদেশে এই ভাইরাসের হদিশ মেলে, যখন তালের রস খেয়ে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। জানা যায়, ফলগুলিতে কোনও-না কোনওভাবে বাদুড়ের দেহরস বা লালা লেগেছিল। সংক্রামিত মানুষ থেকে এই রোগ ছড়াতে পারে, তার প্রমাণ মিলেছে ভারতবর্ষেই। এনআইভি'র কারণে মানুষ ছাড়াও শুয়োর এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু সংক্রামিত হতে পারে। মনে রাখতে হবে, এই ভাইরাসের কোনও প্রতিষেধক নেই।

তবে এই ভাইরাস নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ এই বাদুড়ের মানুষের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। ১ শতাংশেরও কম সংখ্যক বাদুড় এই ভাইরাস আক্রান্ত হয়। এই ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করার কয়েকদিন পর উপসর্গ শুরু হয়। তিন-চারদিন ধরে জ্বর এবং মাথাযন্ত্রণা ও তারপর এনকেফালাইটিস, তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, অসংলগ্ন কথাবার্তা এই রোগের উপসর্গ। এনকেফালাইটিস হওয়ার দুই থেকে তিনদিনের মাথায় রোগী কোমায় চলে যেতে পারে।

ইবোলা ভাইরাস

যত ধরনের ভাইরাস মানুষের ক্ষতি করে, ইবোলা বোধহয় তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক। ইবোলা ভাইরাসের প্রকোপ প্রথম দেখা যায় ১৯৭৬-এ ইয়ামবুকুতে। মূলত আনস্টেরিলাইজড সিরিঞ্জ থেকে এ অসুখ ছড়ায়। এছাড়াও আক্রান্ত ব্যক্তির দেহরস থেকেও ছড়ায়। এ রোগের উপসর্গ বলতে তীব্র জ্বর (১০২ ডিগ্রির বেশি), ডায়রিয়া, মলের সঙ্গে রক্তপাত, পেটব্যথা, ক্লান্তি, হাত-পা অবশ হয়ে আসা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিন তিনেকের মধ্যে মৃত্যু। ২০১৪-তে ইবোলা ভাইরাসের প্রকোপে এক বছরের মধ্যে পশ্চিম আফ্রিকায় ৮০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকার বাইরেও ইবোলার প্রকোপে মৃত্যু হয়েছিল, যারা সেই সময়ে কোনও না কোনও কাজের সূত্রে পশ্চিম এশিয়ায় গিয়েছিল। তাদের অনেকের দেহেই মিলেছিল ভাইরাসের চিহ্ন। তবে মানুষের শরীরে ইবোলা ভাইরাসের প্রভাব একরকম নয়। একদিকে যেমন মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, অপরদিকে তেমনই কারও কারও দেহে উপসর্গ অত্যন্ত মৃদুও হতে পারে।

২০১৯-এ ইবোলা ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়, যেটি ইবোলা ভাইরাস প্রতিরোধে ৭০ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত সফল।

জিকা ভাইরাস

এটির বাহক মশা। দিনের আলোয় সক্রিয় এডিস মশাই এই ভাইরাসের বাহক। ভাইরাসটির এহেন নাম এসেছে উগান্ডার জিকা জঙ্গলের নামানুসারে। যেখানে ১৯৪৭ সালে এই ভাইরাস প্রথম ধরা পড়ে। ১৯৫০ থেকে আফ্রিকা ও এশিয়ার মাঝ বরাবর বিষুবরেখা বরাবর অঞ্চলটিতে এই ভাইরাসের প্রকোপ দেখা গেছে। ২০০৭ থেকে ২০১৬-র মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে। প্রশান্ত মহাসাগর পার করে আমেরিকাতেও ২০১৫- ২০১৬-তে জিকা ভাইরাস মহামারী সৃষ্টি করেছিল।

জিকা ভাইরাস থেকে হয় জিকা ফিভার। প্রথমদিকে বিশেষ কোনও উপসর্গ থাকে না। তবে ত্বকে র‍্যাশ থাকতে পারে। ডেঙ্গুর মতো এই জ্বরেরও কোনও আলাদা ওষুধ নেই। সাধারণ প্যারাসিটামল দিয়েই এর চিকিৎসা করা হয়। গর্ভবতী মহিলার শরীরে জিকা ভাইরাস প্রবেশ করলে গর্ভস্থ শিশুও আক্রান্ত হয়। যার ফলে গর্ভস্থ শিশুর মস্তিষ্কের গঠন বিকৃতি হতে পারে। এছাড়াও জন্মগত নানা

ধরনের ত্রুটি থাকতে পারে। ২০১৬-তে ইউনাইটেড স্টেটস্ সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) জিকার প্রকোপ রয়েছে এমন দেশে পর্যটকদের যাওয়ার ওপর শর্ত আরোপ করে। গর্ভবতী মহিলাদের সেইসব অঞ্চলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এমন কী কলম্বিয়া, পুয়ের্তো রিকো, ইকুয়েডর, জামাইকা ইত্যাদি যেসব দেশে জিকার প্রকোপ দেখা গিয়েছিল, সেখানে মহিলাদের সাময়িকভাবে গর্ভধারণ না করার পরামর্শ দিয়েছিল সেই দেশের সরকার।

স্ত্রী এডিস মশা ছাড়াও জিকা ভাইরাস যৌন সংসর্গের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে। ২০১৬-তে যৌন সংসর্গ দ্বারা জিকা ভাইরাস সংক্রমণের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে আর্জেন্টিনা, চিলি, ফ্রান্স, ইটালি, নিউজিল্যান্ড ও আমেরিকায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংক্রামিত পুরুষের দেহ থেকে নারীর দেহে এসেছে এই ভাইরাস। এছাড়াও রক্ত দেওয়ার সময়ও এই ভাইরাস সংক্রামিত হয়।

জিকা ফিভার উপসর্গের দিক থেকে ডেঙ্গু জ্বরের মতোই আকার নেয়। চোখ লাল হওয়া, অস্থিসংযোগস্থলে ব্যথা, মাথা যন্ত্রণা, গায়ে র‍্যাশ এবং সঙ্গে জ্বর। উপসর্গগুলি মোটামুটি সাতদিন থাকে। এই জ্বরে মৃত্যু সাধারণত হয় না। রোগের উপসর্গ থাকাকালীন রোগীর রক্ত, মূত্র বা লালা পরীক্ষা করে এই ভাইরাস সনাক্ত করা হয়।

মশা নির্বংশ করাই এই রোগের প্রধান প্রতিরোধ। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যাতে মশা বংশবিস্তার না করতে পারে। এছাড়াও দিনের বেলা মশারি, মশার ধূপ ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত। এই রোগেরও তেমন কোনও প্রতিষেধক নেই। তাই জিকার উপসর্গগুলির চিকিৎসা করা হয়।

- যথেষ্ট বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।
- প্রচুর তরল খাবার খেতে হবে।
- জ্বর বা মাথাব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য ওষুধ খাওয়া চলবে না।

যাঁরা জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করছেন, সাবধানতা প্রয়োজন তাঁদেরও— রোগীর রক্ত বা অন্য কোনও দেহরস বা বর্জ্য যেমন মল-মূত্র বা বমির সংস্পর্শে আসা চলবে না। জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীকে স্পর্শ করার পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে। জামাকাপড়ে রোগীর রক্ত বা বর্জ্য লেগে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে জামাকাপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। রোগীর ঘর প্রতিদিন ডিসইনফেকট্যান্ট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। জিকা রোগীকে স্পর্শ করলে রোগ সংক্রমিত হয় না, তবে স্পর্শ করার পর হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।

বার্ড ফ্লু

বার্ড ফ্লু বা অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা শুধু যে পাখিদেরই হয় তা নয়, হতে পারে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুরও। সাধারণত যে ভাইরাসের কারণে বার্ড ফ্লু হয়, তার নাম H5N1 । মানুষের শরীরে এই ভাইরাসটি প্রথম পাওয়া গিয়েছিল ১৯৯৭-এ হংকঙে। এই ভাইরাস সাধারণত মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় না। এই ভাইরাসটিও যথেষ্ট বিপজ্জনক। তবে এই উপসর্গ সাধারণ ফ্লু-এর মতোই। সেই সঙ্গে থাকতে পারে—

● সর্দি ● ডায়রিয়া ● শ্বাসকষ্ট ● জ্বর ● মাথাব্যথা ● গায়ে ব্যথা ● গলায় সংক্রমণ।

যাঁরা পোলট্রিতে কাজ করেন, তাঁদের এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সংক্রামিত পশুপাখির মল, নাক-চোখ-মুখ থেকে বেরোনো লালা থেকে এই ভাইরাস ছড়ায়। বার্ড ফ্লু হওয়া হাঁস-মুরগির ডিম বা মাংস যদি ভালোভাবে রান্না করে খাওয়া হয়, তাহলে তা থেকে মানুষের বার্ড ফ্লু হয় না। তবে ডিম ভালোভাবে সেদ্ধ করে তবেই খাওয়া উচিত। বার্ড ফ্লু সংক্রামিত প্রাণীটি তার মল ও লালার সঙ্গে দশদিন পর্যন্ত ভাইরাস ছড়াতে পারে। তাই পোলট্রিতে কাজ করা ব্যক্তি বা এমন কেউ যে সংক্রামিত পাখির সংস্পর্শে এসেছে, বা ডিম কাঁচা অবস্থায় খেয়েছে, উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না না করা মাংস খেয়েছে বা বার্ড ফ্লু হয়েছে এমন রোগীর সেবা করছে, তাদের এইসব ক্ষেত্রেই বার্ড ফ্লু হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের বার্ড ফ্লু'র বিভিন্ন উপসর্গ থাকে, চিকিৎসাও উপসর্গ অনুসারেই হবে। সাধারণত অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ (যেমন ট্যামিফ্লু) দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা হয় উপসর্গ প্রকাশ পাওয়ার দু'দিনের মধ্যে ওষুধ খাওয়া উচিত।

মানুষের শরীরে বার্ডফ্লু'র যে ধরনটি হয়, তাতে কিছু অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের বিরুদ্ধে শরীরে প্রতিরোধ তৈরি হয়ে যায়, সেই ওষুধগুলি দেওয়া উচিত নয়। পরিবারে কারও ফ্লু হলে পরিবারের অন্যান্যরা প্রতিরোধ হিসেবে অ্যান্টিভাইরাল খেতে পারেন। সংক্রমণ তীব্র হলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, সেক্ষেত্রে ব্রিদিং মেশিন প্রয়োজন হতে পারে।

বার্ড ফ্লু ঠিক কতটা বিপজ্জনক, সেটা নির্ভর করে কোন ভাইরাসের কারণে রোগটি হয়েছে তার ওপর। H5N1 ভাইরাসটি মারণ ভাইরাস, অন্যগুলি তত বিপজ্জনক নয়। এছাড়া কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেপসিস, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট বা অর্গান ফেলিওর এর মতো জটিলতাও হতে পারে।

মানুষের যে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়, তার জন্য ফ্লু ভ্যাকসিন আছে। তবে মানুষের যদি সাধারণ ফ্লু এবং বার্ড ফ্লু একসঙ্গে হয়, সেক্ষেত্রে এটি মারণরোগে পরিণত হতে পারে। অল্প তাপমাত্রায় রান্না করা বা সুসিদ্ধ নয় এমন মাংস, ডিম খাওয়া উচিত নয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, পরিবেশ পরিষ্কার রাখা এবং সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ☐

With Best Compliments from -

A Well Wisher

হিন্দু মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা

এক ব্রহ্মবিদ সন্ন্যাসীর বাস্তববোধ প্রতিফলিত

কল্যাণ গৌতম

ভাবঘনমূর্তি স্বামী প্রণবানন্দজী। তিনি এক যুগপুরুষ। তিনি পতিতপাবন। তিনি ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী যুগাচার্য। তিনি হিন্দু জাতি-গঠনের জন্য হিন্দুদের মধ্যে জনসংগঠনের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় সঙ্ঘজীবনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সঙ্ঘবদ্ধ থাকার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। এটির মধ্যে বৌদ্ধবিহার ও শিক্ষাসঙ্ঘের একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

তিনি যেভাবে ভেবেছিলেন শাস্ত্র ও সমাজজীবনকে মেলাবেন; তারই পরিণতি আজকের ‘ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ’। তারই পরিণতি ‘প্রণব কন্যামঠ’। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্মক্ষেত্র মূলত ভারতবর্ষ হলেও ভারতের বাইরে সমগ্র হিন্দুদের মধ্যে তার প্রভাব রয়েছে। ভারতীয় জাতির পুনর্গঠনই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

সঙ্ঘ-সৃষ্টি বিষয়ে তিনি বলেছিলেন সংগঠনের নামে ‘ভারত’ কথাটি থাকতে হবে। কেন? কারণ, ভারত কেবল একটি দেশের নাম নয়। ভারত বলতে বোঝানো যায়, এই সঙ্ঘ ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সঙ্ঘ ভারতের মহান ধর্ম, সংস্কৃতি, আদর্শ ও ভাবধারা সারাবিশ্বে প্রচারও করবে। ভারতীয় সনাতন বৈদিক আদর্শই সঙ্ঘের ভিত্তি।

আশ্রম কথাটি কেন? ‘আশ্রম’ এই শব্দটি দিয়েও বোঝ যাবে এই সংগঠনের মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রাচীন ভারতের বৈদিকভাব, প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতির আদর্শ। সুতরাং ‘আশ্রম’ শব্দটি বাদ দেওয়া চলবে না। জাতিগঠন, সমাজসেবা ও সমাজগঠন, এবং ব্যক্তি নির্মাণ জনিত— সবরকম সেবাই হবে সঙ্ঘের প্রধান কাজ। ‘সেবা’ নানানরকম হতে পারে। অসুস্থ, পীড়িত ব্যক্তিকে শারীরিক ভাবে সেবা। মানসিক প্রশান্তি লাভ করানোর জন্য সেবা। মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ বাড়ানোর জন্য সেবা। এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিক সেবা; অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ করানোর জন্য সঙ্ঘের প্রচেষ্টা। কারণ মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বর উপলব্ধি। সেবাই হবে সঙ্ঘের ধর্ম। সেবাই হবে সঙ্ঘের কর্ম; সুতরাং ‘সেবা’ কথাটিও সংগঠনের মধ্যে থাকবে স্বামী প্রণবানন্দজী বললেন।

‘সঙ্ঘ’ এই শব্দের মধ্যে রয়েছে সংহতি-চেতনা। এক হয়ে থাকা। সঙ্ঘ কথাটিও আমরা বৌদ্ধ যুগের সন্ন্যাসী সঙ্ঘের থেকে পাই। তার মানে, নামের মধ্যেই কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধের সম্মিলন ঘটছে। খুবই সুচিন্তিত বিষয়।

এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গুরু মহারাজ বলেছেন, ‘আমার সঙ্ঘ হবে দ্বিতীয় বুদ্ধের সঙ্ঘ। আমি সমগ্র দেশ ও জাতিকে বুদ্ধ-শঙ্কর- চৈতন্যের মতো আদর্শ ও তপঃশক্তিতে সঞ্জীবিত করতে চাই।’ তিনি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চাইলেন কেন?

কারণ, একটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিশাল জাতিকে এক ধর্মসূত্রে গেঁথে নেবার প্রয়োজন তখন ছিল। নইলে হিন্দুজাতি সেই সময় মস্ত বড়ো বিপদের সম্মুখীন হতো। সংগঠনের নামে সঙ্ঘ-শক্তি-সূচক শব্দ তিনি যোগ করেছিলেন।

স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের 'সেবা'-র পরিধি ছিল বহুধা বিস্তৃত; সেবা বলতে তিনি কেবলমাত্র দুর্গত মানুষের সহায়তা, পুনর্বাসন ও নিরাপত্তা বোঝাননি। সমস্ত মানুষের সঠিক উন্নয়নকে তিনি 'সেবা' বিবেচনা করতেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তাই তীর্থ সংস্কার করেছে। শিক্ষাবিস্তার করেছে। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ করেছে, গিরিবাসী-বনবাসী মানুষের উন্নয়ন করেছে, দাতব্য চিকিৎসার পাশাপাশি হিন্দু সংস্কৃতির উদ্বোধন নতুন করে করেছে। হিন্দুর সুরক্ষা দিয়েছে। এবং শুদ্ধিকরণের দ্বারা ধর্মান্তরিতকে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে এনেছে। এই পুনর্বাসনকে সেবা প্রতিপন্ন করে তুলেছিলেন গুরুমহারাজ। তিনি হিন্দুধর্মের মানুষকে মহামিলনে সম্মিলিত করালেন। এবং তাকেও সেবা আখ্যা দিলেন।

১৯১৭ সালের মাঘীপূর্ণিমার দিন বাজিতপুরের সিদ্ধপীঠে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কর্মযোগের মাধ্যমে। পরে ১৯২২ সালে কলকাতায় একটি ভাড়াবাড়িতে আশ্রম স্থাপিত হলো। ১৯২৩ সালে বাজিতপুরের সিদ্ধপীঠে মাঘীপূর্ণিমার পরদিন সঙ্ঘ-সন্তানদের একটি আলোচনা সভায় সংগঠনের নামকরণ হলো 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'। ১৯৩০ সালে তিনি বাজিতপুরেই গড়ে তুললেন 'শ্রীশ্রী প্রণব মঠ'।

একদিন আঞ্চলিক সেবাশ্রমগুলির মাধ্যমে ব্রহ্মচারী বিনোদ (স্বামী প্রণবানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম 'বিনোদ') সেবার যে বীজ বপন করেছিলেন, তাই আজ 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ' নামে পল্লবে-কুসুমে বিপুলায়তন হয়েছে। বনস্পতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আজ ভারতের কোণে কোণে নানান তীর্থস্থানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শাখাপ্রশাখা। ভারতের বাইরেও বৃদ্ধি হয়েছে তার কর্মযোজনা। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ তাই ভারতের গর্ব, বিশ্বেরও অস্মিতা।

স্বামী প্রণবানন্দ মনে করতেন, ভারত 'ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিদ'। ভারত তপঃশক্তির অপূর্ব মহিমাঘন-মূর্ত আদর্শ। এই আদর্শকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। হিন্দু ধর্ম ছড়িয়ে পড়লে সমগ্রজগৎ শান্তি ও সান্ত্বনা পাবে। তাই এটি একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ এবং স্বামী প্রণবানন্দ--- অভিন্ন নাম। প্রণবানন্দজী পরিষ্কার করে বর্তমান যুগের বিষয়গুলি সূত্রাকারে বলে গেছেন। চারটি সূত্র— মহজাগরণ, মহাসমন্বয়, মহামিলন ও মহামুক্তি।

হিন্দু তার সুদীর্ঘ অচৈতন্য অবস্থা থেকে জেগে উঠে সকল বাধা ছিন্ন করে পারস্পরিক সমন্বয়ের কাজ করবে। তাতেই হবে মহামিলন। এভাবেই হিন্দু এক মহান জাতি হিসেবে মুক্তি পাবে। হিন্দু জাতির জন্য তিনি সাধন-উপলব্ধির মহান-সত্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এটাই হলো সঙ্ঘবাণী (Ten divine messages)।

এগুলিকেই তিনি জগতের কল্যাণের জন্য প্রচার করতে বলেছেন। এগুলিকে বলা যায় যুগ-মন্ত্র। এগুলিকে বলা যায় হিন্দু জাগরণ মন্ত্র। এগুলি হিন্দুর, দেশবাসীর নিত্যপাঠ দরকার। এই সঙ্ঘবাণীগুলি কী কী? আমরা এক এক করে জেনে নেবো।

১. লক্ষ্য কী?

আমাদের লক্ষ্য হলো আত্মপোলব্ধি ও মহামুক্তি।

২. ধর্ম কী?

ধর্ম হলো ত্যাগ, সংযম, সত্য ও ব্রহ্মচর্য।

৩. মহামৃত্যু কী?

আত্ম-বিস্মৃতি।

৪. প্রকৃতজীবন কী?

আত্মবোধ, আত্মস্মৃতি, আত্মানুভূতি।

৫. মহাপুণ্য কী?

বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব এবং মুমুক্ষুত্ব।

৬. মহা পাপ কী?

দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা।

৭. মহাশক্তি কী?

ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতা।

৮. মহাসম্বল কী?

আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা, আত্মমর্যাদা।

৯. মহাশত্রু কী?

আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা, রিপু ও ইন্দ্রিয়বৃন্দ।

১০. পরমমিত্র কী?

উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যাবসায়।

তিনি মানব জীবনের মহালক্ষ্য বলতে আত্মপোলব্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, হিন্দুদের আত্মবিস্মৃত হলে চলবে না। আত্মবিবেক যদি চলে যায় তবে তা মহামৃত্যুর সমতুল্য। বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব ও মুমুক্ষত্বই হচ্ছে মহাপুণ্য এবং সারাজীবন তারই অধ্যবসায় করে যেতে হবে। দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতা কাটিয়ে হিন্দুকে তথা ভারতবাসীকে এগিয়ে যেতে হবে।

তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবান্দোলনের গনগনে সূর্য। তখনও ঠাকুর-মা-স্বামীজীর সামীপ্যে সান্নিধ্যে আসা বহু মানুষ বেঁচে আছেন ভারতভূমিতে। এই অবস্থায় কেন প্রয়োজন ঘটলো আর একটি সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের? কেন হিন্দু সমাজকে ডাক দিয়ে 'শক্তি-সংগঠন- সেবা-সমন্বয়-সংযম'-এর আদর্শে ফের তৈরি করতে হলো 'ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'? তার একমাত্র কারণ দেব ও অসুরের দ্বন্দ্ব। অবতার বরিষ্ঠের অমর-বাণীকে ব্যাখ্যায় ভুল করেছিলেন সাধারণ মানুষ। অমর-পথে আসুরিক শক্তি বা হিংস্র-মত থাকতে পারে কিনা তার ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই করেছিলেন ধর্মপ্রাণ হিন্দু। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে নেমে এল হিন্দুদের উপর বিধর্মীদের একের পর এক আক্রমণ ও অত্যাচার। তারও পরে লিগের শাসন এবং তার ধারাবাহিকতা। হিন্দুরা নতুন করে ভাবতে শিখলো যাদের পথ কেবলই আসুরিক, যাদের কাছে হিন্দু মাত্রেই কাফের ও হিদেন, তাদের সর্বধর্ম সমন্বয় শেখানো নিতান্তই বাতুলতা। শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজকে কেটে আরও টুকরো করতে চাইলো তখনকার 'টুকরে-গ্যাং'। তাদের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে ফারাক খুঁজে পেল না রাজনীতির ভয়ংকর সুবিধাবাদী মানুষদের। ফারাক করা গেল না চতুর বুদ্ধিজীবীকে। তারা হিন্দুদের বিভেদ বাড়িয়ে দেখানোর জন্য কোনও কোনও শাস্ত্রের দিকে আঙুল তুললো

এবং হিন্দুদের যথাসম্ভব শাস্ত্র-বিরোধী করতে সচেষ্ট হলো। অথচ শাস্ত্রে এমন কাজের নির্দেশ দেওয়া তো দূরের কথা, সমর্থনও নেই। এই অবস্থায় হিন্দু জীবনচর্যার ধারায় সাময়িক বিক্ষিপ্ততায় নতশির জাতির সামনে উপস্থিত হলেন এক তাপস-শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী। শিবপুরুষ স্বামী প্রণবানন্দ। হিন্দুদের দিয়ে গেলেন অকুতোভয় আত্মবিশ্বাসের সুর। হিন্দুধর্মের আহ্বান 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' কথাটি ছিল; 'অয়তু সর্বতো স্বাহা' বলা ছিল। এবার এই সন্ন্যাসী বলতে এলেন, 'হিন্দু বিদ্যায় বড়ো, বুদ্ধিতে বড়ো, অর্থ সামর্থ্যেও সে কাহারও অপেক্ষা কম নয়। কিন্তু নাই কেবল সংহতি শক্তি। এই সংহতিশক্তির অভাবেই হিন্দু আজ সর্বত্র লাঞ্ছিত, নির্যাতিত। সর্বপ্রকার ভেদ-বৈষম্য, অনৈক্য-পার্থক্য, ঈর্ষা-দ্বেষ বিদূরিত করিয়া এই শতছিন্ন হিন্দু সমাজকে যদি আবার ঐক্য, সখ্য, প্রেম, প্রীতি ও মিলনের সূত্রে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলেই হিন্দু আবার তাহার সুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া জগতে অজেয় হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে।'

গুরু মহারাজ বললেন, 'আমি হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দিতে চাই। আমি সমগ্র হিন্দু জনসাধারণকে 'আমি হিন্দু, আমি হিন্দু, আমি হিন্দু, জপ করাব।'

হিন্দুকে হিন্দু বলে ডাক দেবার মূল্য চুকাতে হয়েছিল যুগাচার্যকে। স্বার্থান্বেষীরা তাঁকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে দেগে দিল; যেমন দেগে দিয়েছিল 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রকে; যেমন দেগে দেওয়া হয়েছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে। অথচ বঙ্কিম সবসময় বুদ্ধিজীবীর সততা রক্ষা করেছেন, বিধর্মীদের হিংসাত্মক কাজের সমালোচনা করলেও তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলেননি, তিনি ইতিহাস বিকৃতি কখনও করেননি। একইভাবে ড. শ্যামাপ্রসাদকে অসাম্প্রদায়িক বলে বর্ণনা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ধর্মে অনুরাগী হয়, কোনো ব্যক্তি যদি সঙ্ঘশক্তিতে হিন্দুদের জাগাতে চান, তবে তিনি সাম্প্রদায়িক হবেন কেন?

ভারতবর্ষের অহিন্দুরা সেই সময় সঙ্ঘবদ্ধ ছিল, সুগঠিত ছিল। কিন্তু হিন্দুরা অসাড়-অবশ হয়ে ঘুমিয়ে ছিল। এমনই জাতিকে জাগিয়ে তারই শাখা-প্রশাখাগুলিকে সমন্বিত করে হিন্দু জাগরণ ঘটিয়েছিলেন যুগাচার্য প্রণবানন্দজী। বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে যদি শক্তিশালী করতে হয়, তবে শক্তিশালী হিন্দু জাতির উত্থান ছাড়া তা সম্ভব নয়। নানা জতির মিলন সর্বদা সমানে সমনে করা উচিত। সবলে-দুর্বলে মিলন হয় না। তিনি পরিস্কার বলেছেন, 'আমি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করতে চাইনে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী দুষ্টের দমন চাই।' তিনিই হলেন বাজিতপুরের বাজিগর স্বামী প্রণবানন্দজী।

সেবা আর হিন্দু মিলন মন্দির নির্মাণের জন্যই তাঁর ধরাধামে আবির্ভাব। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সবরকম সমস্যার সমাধান করতে তিনি এসেছিলেন। হাজার হাজার হিন্দুকর্মী, শত শত ত্যাগী সন্ন্যাসীকে ছড়িয়ে দিতে তাঁর আগমন। স্বামীজী ছিলেন মিলনের ঈশ্বর। সে মিলন ছিল হিন্দুত্বের। সে সমন্বয় ছিল সনাতনের। সে বাঁধন ছিল ভারতবর্ষকে বাঁচানোর। কেমন সেটা?

'শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়/বাজিতপুর প্রাণের পুর, মিলনভূমি ভাই।'

স্বামী প্রণবানন্দ এবং ড. শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে শিবাজীর হিন্দু জাতি-গঠন-ভাবনার উত্তরাধিকার আমরা লক্ষ্য করেছি। এবছর শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের সাড়ে তিনশো বছর। তাই প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলা যেতে পারে।

শিবাজীর গুরু ছিলেন রামদাস স্বামী, যার জন্য সাতারা দুর্গ জয় করার পর সজ্জনগড়ে আশ্রম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন শিবাজী। গুরুকে অঢেল ধন আর ঐশ্বর্য দান করলেও তাঁকে দৈনিক ভিক্ষায় যেতে দেখে শিবাজী মর্মাহত হলেন। গুরুদেবের সাধ মেটাবেন, পণ করলেন শিবাজী। রাজ্যের যা কিছু সম্পদ, এমনকী গোটা মহারাষ্ট্র রাজ্যটাই গুরুকে দান করার শপথ নিলেন। এরজন্য যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত করলেন শিবাজী। তৈরি হলো দানপত্র। পরদিন সকালে গুরু রামদাস যখন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বের হবেন, স্বয়ং শিবাজী গুরুর পদতলে সমর্পণ করলেন সমগ্র রাজ্য। গুরু শিষ্যকে বুকে টেনে নিয়ে হেসে বললেন, 'তোমার দান আমি গ্রহণ করলাম; এখন থেকে তুমি আমার গোমস্তা হলে। ভোগী, সুখী, স্বেচ্ছাচারী রাজা না হয়ে বিশ্বাস করো, তুমি যেন এক জমিদার প্রভুর বিশ্বাসী ভৃত্য হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করছো। রাজ্যশাসনের দায়িত্বজ্ঞান যেন তোমার থাকে।' ছত্রপতি শিবাজী মেনে নিলেন হিন্দু যোগীর সর্বাধিনায়কত্ব। সেই থেকে শিবাজীর রাজ্য পরিণত হলো এক হিন্দু সন্ন্যাসীর ভাবাদর্শে-চালিত রাজ্য, এক যোগী-রাজ্য। সন্ন্যাসীর

গেরুয়া-বসন দিয়েই নির্মিত হলো রাজপতাকা।

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ হিন্দু জাতিগঠন সংক্রান্ত নানা ভাষণ ও কাজে বারবার হিন্দু সম্রাট ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল গঠনের আহ্বান জানান তিনি। হিন্দু সমাজের বিপন্নতার বিষয় তুলে ধরেন। কারণ ১৯৩৭ সালের পর থেকে বঙ্গপ্রদেশের রাজনীতিতে হিন্দু বিরোধী অহিন্দুদের আধিপত্যবাদ বাঙ্গালি হিন্দুজীবনে গভীর সংকট তৈরি করেছিল। নোয়াখালিতে সংগঠিত হলো হিন্দুদের উপর অত্যাচার। গোলাম সারওয়ার ও গোফরানের নেতৃত্বে কৃষক সমিতির অন্তরালে একদল মানুষ হিন্দুদের মধ্যে ক্রমাগত আতঙ্ক সৃষ্টি করলো। তারপর যা হয়েছিল, ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায়। ১৯৪০ সালের ৭ মে নোয়াখালিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল কেমন হবে, তা বলতে গিয়ে গুরুমহারাজ বললেন, ছত্রপতি শিবাজী, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের জাতি গঠনের পদ্ধতি যেমন ছিল, আমার হিন্দু-জাতিগঠন আন্দোলনও সেই ধারায় হবে।

স্বামীজীর আশীর্বাদধন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, যাকে 'শিবাজীর কার্যকরীরূপ' বলে বর্ণনা করা হয়, তিনি নোয়াখালির হিন্দুদের দুর্দশাকে এবং তার মোকাবিলাকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দিলেন। স্বামীজী এই যাত্রায় দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী শিবের রুদ্রমূর্তি সঙ্গে নিলেন। আর সঙ্গে নিয়েছিলেন বাছাই করা হিন্দু বীরদের। 'আমি কোনো কাপুরুষকে আমার সঙ্গে নেবো না, মাথা দিতে পারে, মাথা নিতে পারে— এমন লোক আমার সঙ্গে চলুক।' ত্রিশূল হাতে আচার্যদেব মঞ্চে বসে থাকতেন। পরনে গৈরিক বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মুখে শিবাজীর পথে হিন্দুজাতি গঠন ও ধর্মরক্ষার বাণী। সাফ কথা, 'হিন্দু শির দিয়েছে, কিন্তু সার দেয় নাই।' ১৯৪০ সলের ৬ মে পূর্ববঙ্গের বাবুরহাট সম্মেলনে বললেন, আজ প্রত্যেক হিন্দুকে রাণাপ্রতাপের মতো, ছত্রপতি শিবাজীর মতে, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের মতো স্বধর্ম ও সমাজ রক্ষার ব্রত ও দায়িত্ব নিতে হবে। জাতিগঠন মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে। বাঙ্গালি হিন্দুর শিরায় শিরায় দুর্জয় বীর্যসঞ্চারের জন্য ১৯৪০ সালের ১৩ মে কুমিল্লার হিন্দু সম্মেলনে স্বামীজী আবার শিবাজী-স্মরণ করলেন, শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ যে পন্থায় যথাক্রমে মারাঠা ও শিখ জাতিকে মহাজীবন দান করেছিলেন, আমি বাঙ্গলায় সেই সংগঠন-পদ্ধতিক্রমে পরাক্রমশালী হিন্দু-সংহতি গঠন করবো। এই আত্মরক্ষা ও আত্মগঠন প্রচেষ্টাকে প্রবল করে তুলতে পারলে হিন্দুসমাজের তুচ্ছ ভেদ-বিবাদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর হয়ে যাবে।

এরপর দেখা যায়, হিন্দুদের পাশে সব সময় অবস্থান করবেন এমন একজন প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দু নেতাকে খুঁজছেন। কেমন নেতা? যার মধ্যে শিবাজীর মতো অকুতোভয় শক্তি আছে। খুঁজে পেলেন তিনি। ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিন নিজের মালায় বরণ করে নিলে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে। নিজের সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করে দিলেন শ্যামাপ্রসাদকে। বাঙ্গালির জন্য এক শিবাজী-প্রতিম নেতা নির্বাচিত হলো। ১৯৪০ সালে শৈবপীঠ বারাণসীতে দুর্গাষ্টমীর দিন শ্যামাপ্রসাদকে রুদ্ধদ্বারে ডেকে নিয়ে জাগালেন তাঁর মধ্যে থাকা যাবতীয় উদ্যম ও নৈপুণ্য। আচার্যের আশীর্বাদে শ্যামাপ্রসাদের অন্তরে সুপ্ত সিংহ গর্জন করে উঠল। তিনি মহাবিক্রমে প্রায় এককভাবেই অভ্যুত্থান করলেন। পাকিস্তান-রাক্ষসের কবলে সমগ্র বঙ্গপ্রদেশকে উৎসর্গ করবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। বঙ্গপ্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গ ছিনিয়ে এনে বাঙ্গালি হিন্দুর দাঁড়াবার স্থান দিয়ে গেলেন। স্বামী প্রণবানন্দজীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'মহামৃত্যু কী?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আত্মবিস্মৃতি'। নিজেকে ভুলে যাওয়া, নিজের পূর্ব ইতিহাস ভুলে যাওয়া; নিজের পরিবার, গোষ্ঠী, ধর্মের প্রতি নেমে আসা অসংখ্য আক্রমণের ধারাবাহিকতা ভুলে যাওয়ার নামই হলো 'আত্মবিস্মৃতি'। বাঙ্গালি হিন্দু এখন এক চরম আত্মবিস্মৃত জাত। তারা সহজেই তার উপর নেমে আসা প্রভূত-প্রহার ভুলে গেছে। অপরিমিত অন্যায়-অত্যাচার ভুলে গেছে। ভুলে গেছে বলেই তাদের ক্রমাগত পালিয়ে বাঁচতে হয়। 'পূর্ব থেকে পশ্চিমে' দৌড়। আরও পশ্চিমে দৌড়। দৌড়-দৌড়-দৌড়। জীবন হাতে করে পাশবিক পঙ্কিল পরিবেশ থেকে মুক্তির দৌড়। জলছবিটির মতো নিজের গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনের সন্ধানে নিজের ধর্ম নিয়ে দৌড়! ম-বোন-বউ- মেয়েকে ভয়ংকর পশুর মুখে বাধ্য হয়ে ফেলে রেখেই জীবন বাঁচানোর দৌড়! এই আত্মবিস্মৃতি থেকে বাঙ্গালি তখনই রেহাই পাবে, যখন যাবতীয় জীবনের জিঘাংসার সালতামামি তারা ভুলে যাবে না। সম্প্রীতির আলিঙ্গন নিয়ে বাস করেও প্রতিবেশীর আক্রমণের সহিংসতার ইতিহাস মনে রাখতেই হবে। তবে বাঙ্গালি হিন্দু টিকে থাকবে। এই জীবন থেকে মুক্তির পথ কোথায়? হিন্দুকে বেঁচে থাকতে হলে সংগঠিত হয়েই থাকতে হবে। প্রায় একশো বছর আগেই বলে গিয়েছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দুরক্ষী স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। বলেছিলেন 'সঙ্ঘশক্তি কলিযুগে'। তিনি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিশাল জাতিকে এক ধর্মসূত্রে গেঁথে নেবার প্রয়োজন আছে। তিনি হিন্দুকে মহামিলনে সম্মিলিত করাকে সেবা আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। এই কাজে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বিদ্বজ্জনের অংশগ্রহণ জরুরি, জরুরি ছাত্র ও যুবশক্তির অংশগ্রহণ, মাতৃশক্তির মহাজাগরণ। পশুশক্তি প্রতিবেশীর রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং তারা ঐতিহাসিক কারণেই শক্তিমান। স্বামী প্রণবানন্দজী বলছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা তখনই সম্ভব হবে, যখন উভয়েই শক্তিশালী ও মত প্রকাশে বলিষ্ঠ হবে। তাই হিন্দুদের জাগরণ জরুরি। এই জাগরণের ভরসা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। তিনি আমাদের সকলের অন্তরে প্রকাশিত হোন। এই আমাদের প্রার্থনা। ■

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের মাতৃশক্তি ভাবনা এবং প্রণব কন্যা সঙ্ঘ গঠন

সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দময়ী

প্রণব কন্যা সঙ্ঘের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ আসন্ন। কীভাবে প্রণব কন্যা সঙ্ঘের সৃষ্টি হলো, এ প্রশ্ন অনেকের। তাই স্মৃতির আলোকে এবং পূজ্য স্বামীজীগণের পত্রাবলির সাহায্য নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

সঙ্ঘগুরু আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর পূর্ব সাধক বিশ্ব বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ সমাজের কল্যাণে নারীর ভূমিকা অপরিহার্য বলে প্রথমে স্ত্রী মঠের জমি সংগ্রহ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ওই উদ্দেশ্যে একজন সিংহী মার্গারেট নোবেলকে বিদেশ থেকে এনেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন এদেশে আবার গার্গী, মৈত্রেয়ী, ঘোষা, অপালার মতো নারীর আবির্ভাব হবে। আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজীও পূর্ণিয়ায় তিন জন বিধবাকে গৈরিক বস্ত্র পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। স্বামী সত্যানন্দজীর স্ত্রীকে তেজস্বিনী হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং দুই কন্যাকে হলুদ বস্ত্র দিয়ে ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করার ব্যবস্থা করেছিলেন। নারীর কল্যাণে নারীকেই দায়িত্ব নিতে হবে এ ধারণা তাঁর বদ্ধমূল ছিল।

আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ওই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ স্বামী বেদানন্দজী 'হিন্দু নারীর আদর্শ ও সাধনা' গ্রন্থে আহ্বান করলেন—

ত্যাগ ব্রতধারিণী ব্রহ্মচারিণী
সমাজ সেবিকা চাই

বর্তমান যুগে রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ প্রভৃতি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে শত শত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী জাতির পুনর্গঠনকল্পে সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আত্মকল্যাণ ও জগৎ কল্যাণ তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

আজ প্রয়োজন, হিন্দুনারী-সমাজের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিবার জন্য অনুরূপ শত শত নারীর আত্মজীবন গঠনপূর্বক সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গ। উচ্চ সংস্কার-সম্পন্না শিক্ষিতা মহিলাগণ— কুমারী অথবা বিধবা ত্যাগব্রত গ্রহণপূর্বক শুদ্ধ পবিত্র জীবন লইয়া কর্মক্ষেত্রে নামিয়া শত শত ব্রহ্মচারিণী নারী কর্মী গড়িয়া তুলুন এবং তাহাদের মধ্যে সমাজসেবা-ব্রতের প্রেরণা সঞ্চার পূর্বক শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে হিন্দুত্বের আদর্শ ও সাধনার ভিত্তিতে শিক্ষা ও অনুষ্ঠান-কেন্দ্র স্থাপন পূর্বক হিন্দুনারীগণের পুনর্জাগরণ ও পুনরুত্থান হিন্দুত্বের আদর্শে— আদর্শ কুমারী, আদর্শ বধূ, আদর্শ মাতা, আদর্শ গৃহিণী গড়িয়া তুলিবার সাধনায় নিয়োজিত হোন।

স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ
'হিন্দু নারীর আদর্শ ও সাধনা'
পুস্তক হইতে প্রকাশিত
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

স্বামী অদ্বৈতানন্দজী প্রণব কন্যা সঙ্ঘের প্রচার পত্রিকায় তাঁর ভাবনা প্রকাশ করে লিখলেন—

'প্রণব কন্যা সঙ্ঘ সঙ্ঘনেতা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দের অভীপ্সিত ও আশীর্বাদপূত একটি উদীয়মান সঙ্ঘ। আশা করি, এই সঙ্ঘের ত্যাগব্রতী সেবিকাগণ তাঁর উদার-উদাত্ত ভাবাদর্শ ও কার্যপ্রণালী নিরন্তর স্মৃতিপটে রেখে তাদের ব্রতোদ্যাপনে কটিবদ্ধ হবে এবং অলস ও নিঃস্বার্থ সেবা ও শুভ প্রয়াস শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কৃপায় জয়যুক্ত হয়ে দেশ-জাতি বিশেষতঃ মহিলা সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবে।'

শুভানুধ্যায়ী,
স্বামী অদ্বৈতানন্দ
প্রধান সম্পাদক, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

ফ ঃ ৪

প্রণব কন্যা সঙ্ঘের প্রথমাগত তিনজনের পত্রের উত্তর পাঠে জানা যায় তাঁরা তাদের অধ্যাত্মজীবন কীভাবে উদ্বুদ্ধ করে সমাজ সেবায় এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজীর পত্র

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

কলিকাতা ৯.৩.৫৫

স্নেহের

......। সংসার কর্মভূমি। কর্মযোগ ও কর্মভোগের জন্য মানুষের জন্ম সংসারে। কর্ম শেষ হলেই মানুষকে চলে যেতে হয়। কোনো মায়ার বন্ধন আর তাকে সংসারে বেঁধে রাখতে পারে ন। সুতরাং প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী।ঠাকুরের সঙ্গে সম্বন্ধই নিত্য অবিনাশী। ঠাকুরের চরণে প্রাণমন সমর্পণ করতে পারলেই কর্মভোগ কর্মযোগে পরিণত হয়। সেই কর্মযোগে সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়। জন্ম মৃত্যুর ঘূর্ণমান চক্র থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কর্ম তোমার জীবনে যোগে পরিণত হোক, এই আশীর্বাদ।

ইতি,

শুভানুধ্যায়ী

স্বামী বেদানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, গয়া

১৮.৭.৫৫

স্নেহের,

.....। মনকে ঠাকুরের চরণে রাখিয়া কাজ করিয়া যাও, পড়াশোনা ভালো করিয়া করিতে পারিবে। আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তোল। নৈরাশ্য অবসাদই পরম শত্রু। দৈনিক রুটিন করিয়া সব কাজ করিতে হইবে। পড়াশুনা নির্দিষ্ট সময় মতো ঠিক ভাবে করিতে হইবে। দৃঢ় সংকল্প নিয়া প্রবল উদ্যমে চেষ্টা করিতে হইবে। God helps who help themselves. তোমার প্রতি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ আছে। হতাশা ও নিরাশা ঝেড়ে ফেলো।

ইতি,

শুভানুধ্যায়ী

স্বামী বেদানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

কলিকাতা

২১.২.৫৭

স্নেহের,

খুকু, অবিরাম অবিশ্রাম গুরুমন্ত্র জপ ও ঠাকুরের স্মৃতি নিয়া চলা অভ্যাস কর। ঠাকুরের শিষ্য তুমি। সর্বদাই তাঁর বুকে আছ, এমন ভাব লইয়া চলিবে। মনকে গুরুমুখী করিয়া রাখিতে পারিলে কোনো আজে বাজে চিন্তা ও অপবিত্র ভাব অন্তরে জাগিতে পারিবে না।

ব্রহ্মচারিণী চিদাননন্দময়ীকে শিবরাত্রির পরে তোমাদের ওখানে মেয়েদের মধ্যে প্রচারের জন্য পাঠাইব ভাবিতেছি।

ইতি,

শুভানুধ্যায়ী

স্বামী বেদানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলিকাতা

২২.২.৫৮

স্নেহের,

.......। সাধনার পথ পুষ্পপেলব নয়। অরুচি অক্ষুধা থাকেই। বাধা বিঘ্ন আসেই। সেজন্য সংগ্রাম করে চলতে হয় সাধক-সধিকাকে। মন চঞ্চল হবেই। বেয়াড়ামি করবেই। লক্ষ লক্ষ অভ্যাস ও প্রবণতা দেহ মনে আছে। তাই মনকে সংকল্পের রশ্মিতে আকর্ষণ নিয়মের গণ্ডির মধ্যে পুনঃ পুনঃ একে বাঁধবার চেষ্টা করতে হয়। তুমি মন নও। মনের দাস নও। মন তোমার তুমি মনের প্রভু। মনকে জোর করে তোমার অভীষ্ট পন্থায় চালাতে চেষ্টা কর। মন যতই বেয়াড়া হউক তিক্ত ঔষধ জোর করে সেবন করার মত তাকে গুরু নির্দেশিত ভাবে চালাতে চেষ্টা কর। ফলে মন বশে আসবে। চাই উদ্যম উৎসাহ। প্রশ্রয় দেবে না অলস্য তন্দ্রা দীর্ঘসূত্রতাকে আর অবসাদ ও নৈরাশ্যকে। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহা শক্তি। প্রবাসে দেহটি থাকলেও তুমি অনুক্ষণ তোমার গুরুবাবার কোলে আছ।

ইতি,

শুভানুধ্যায়ী

স্বামী বেদানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলিকাতা

৭.২.৫৯

স্নেহের,

.......। মাঘী পূর্ণিমা ২২ ও ২৩শে

ফেব্রুয়ারি, আসতে পারবে কি? সম্ভব হলে মিনু ও গীতাকে নিয়ে আসবে। থাকার জায়গার অসুবিধা হবে না। তোমাদের তিন জনের সঙ্গে অনেক কাজের কথা আছে। শৈশব ও কৈশোরের আদর আবদার যথেষ্ট হয়েছে। এখন যৌবনের শক্তি নিয়ে সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতার অভীষ্ট সেবা করতে হবে। সংসারের পাওনা মেটাতে যতটুকু সময় ও শক্তি দরকার ততটুকু দিয়ে বাদবাকি সময় ও শক্তি সঙ্ঘ সেবায় ব্যয় করতে হবে। সঙ্ঘ সেবাই নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্মই ধর্ম। সেবার মধ্যে দিয়েই জ্বলবে জ্ঞানের অগ্নি। তাতে ভস্মীভূত হবে ভোগের সংস্কার। তবেই অন্তর হবে নিখাদ স্বর্ণ।

ইতি,

শুভানুধ্যায়ী

স্বামী বেদানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

কলিকাতা

৩০.১০.৬১

স্নেহের,

........। লক্ষ লক্ষ জন্ম বিষয় ভোগের

আসক্তি লেগে আছে মানুষের দেহ মনে বুদ্ধিতে। সেই অসক্তির বেগই (Momentum) দেহমনকে বিষয় ভোগে কামনার পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলতে পারে। তাতে একদিকে হয় মানুষ মায়া, মোহ ভ্রান্তিতে আবদ্ধ, অপরদিকে মানুষের অন্তরের অনন্ত তেজোবীর্য্য পুরুষ হয় আচ্ছন্ন নিষ্ক্রিয়। এতেই মানুষের দুঃখ, তাপ, জ্বালা, ক্লান্তির দাবদাহ অন্তরে ও বাহিরে।

ঠাকুরের আশ্রয় পেয়েছো। গুরুর নিকট দীক্ষা নিয়েছ। কিন্তু তথাপি ঐ আসক্তির বেগ ও প্রবণতা শরীর মন থেকে মুছে যায়নি, যেতে সময় লাগবে। প্রাণে ও মনে যে অজানা ক্ষোভ আসে তার কারণ ঐ আসক্তির রেশ তার খাদ্য চায়, চরিতার্থতা খোঁজে।

সদগুরু তাই আশ্রিত সন্তানের ঐ আসক্তি নিজের প্রতি আকর্ষণ করে নিয়ে ভক্তি প্রীতি সেবায় রূপান্তরিত করে ঊর্ধ্বগামী করে নেন। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত ঈষ্ট ও গুরুর প্রতি স্নেহ অতি ভক্তিসেবার দ্বারা বিষয়ের আসক্তি নির্মূল করতে হয়।

ঐটি জানলে তুমি বুঝবে কেন তোমাকে এত আদর স্নেহ করেছি ও করি। হয়ত অনেক সময় এতটা স্নেহ আদর বিস্ময়কর মনে হয়েছে কিন্তু হয়ত সে রহস্য বুঝবে।

সকলের কল্যাণ চিন্তা কর। সকলের হিতে সেবাদানের আগ্রহ সংকল্প অন্তরে জাগাও। সকলের ব্যথা বেদনা আপন বুকে বহন করতে প্রস্তুত হও। তখন দেখবে তোমার অন্তরের ব্যথা দূর হয়েছে। সকলের কল্যাণ ও সেবা চিন্তায় যথার্থ শক্তির অধিকারিণী হয়েছ।

আমার আদরের সন্তানকে যে আমি সেই ভাবেই দেখতে চাই। মেয়েদের নিয়ে যে মিলন মন্দির সে তো ঐ সেবাব্রতেরই সূচনা।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা, কামনা, কল্পনা সমাজের সকলের হিত কামনায় ও সেবাভবে রূপান্তরিত হয়ে তোমাকে শান্তির অমৃতে অভিসিঞ্চিত করুক--- তাই তো আমার অভিপ্রেত।

তুমি কি তোমার গুরু ও ঈষ্টকে যথার্থ ভালোবাসো, ভক্তি করো? তবে গুরুর মহাভাব ও আদর্শ বরণ কর। সমাজের সেবাব্রত গ্রহণপূর্ব্বক সময় সুযোগ মত কাজ করে যাও। সিস্টার নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ এই কথাই বলেছিলেন। নিবেদিতাও গুরু বিবেকানন্দের সেবার আদর্শে প্রেরিত হয়ে কাজ করে গিয়েছিলেন।

ইতি,

শুভানুধ্যায়ী

স্বামী বেদানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

কলিকাতা

২৮.৬.৬১

স্নেহের,

......। তোমার পত্র ও সমিতির কাজের সংবাদ পেলাম। যেভাবে কাজ চলিতেছে, সেইভাবে চালাতে থাক। ঠাকুরের ভাবে ও আদর্শে সকলকে ভাবিত ও অনুপ্রণিত কর। এর মধ্যে দিয়েই ঠাকুরের শক্তি ও আশীর্বাদ তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে।

অহং এর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই মানুষ আবদ্ধ হয়ে আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।

সমিতির মেয়েদের আপন সন্তানের মত ভালবাস, তাদের সংবাদ নিয়ে তাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে আপন করে নাও। তাদেরকে নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে, নানাভাবে উপদেশ দিয়ে তাদের অন্তরে ভগবদ্ভক্তি, গুরুভক্তি, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, সেবার ভাব জাগিয়ে দিতে চেষ্টা কর। তারাও তোমাদের হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে শিখুক। 'আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনীপরে, সকলের তরে সকলে আমরা

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'। সমিতির সকল মেয়েদের আমার স্নেহাশিষ দেবে। আমার স্নেহাপ্লুত অন্তর তাদের সঙ্গে আছে।

ইতি,
শুভানুধ্যায়ী
স্বামী বেদানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
কলিকাতা, ৫.৩.৬৪

স্নেহের,

.......। সিউড়ী হিন্দু মিলন মন্দিরের ত্রিশূল উৎসব ২১, ২২ ও ২৩ আগস্ট হইবে। ২১শে মার্চ শুক্রবার বেলা ২ ঘটিকায় মহিলা সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। এবার তোমাকেই মিলন মন্দির কর্তৃপক্ষ সভানেত্রী নির্বাচন করিয়াছে। আলোচ্য বিষয় দিয়াছে 'আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন গঠনে নারীর দায়িত্ব', ঐ তারিখে সম্মেলনে তোমাকে অবশ্যই যোগদান করিতে হইবে। তুমি গত বছর যে বাড়িতে ছিলে এবারও সেই বাড়ীতে থাকার স্থান হইবে। আমিও সেইখানে থাকিব। তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। আলোচ্য বিষয়ের সাহায্য 'হিন্দু নারীর আদর্শ ও সাধনা'— বইটিতে পাবে।

ইতি,
শুভানুধ্যায়ী
স্বামী বেদানন্দ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সহ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি দেহত্যাগ করেন। তাঁর স্মৃতিচারণ সভায় ক্রন্দনত ভক্ত-শিষ্য-শিষ্যাগণকে ডাক দিয়ে স্বামী অদ্বৈতানন্দজী (সাধারণ সম্পাদক-ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ) মহারাজ বলেন— 'মহাপুরুষের তিরোধানে তাঁদের একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে মাত্র ইত্যাকার শোক, বিলাপ ও অশ্রুবর্ষণের দ্বারাই আশ্রিত শিষ্যাগণের তাদের সদ্গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ নিঃশেষে পরিশোধ হবার নয়। এজন্য প্রয়োজন আশ্রয়দাতা সদ্গুরুর পুণ্যজীবন, অমরবাণী, আদেশ-নির্দেশের স্মরণ-মনন এবং সেই আদর্শের অনুরূপ আত্মজীবন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর অর্পিত দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা অর্জন করা। বস্তুত এইরূপ প্রয়াস প্রচেষ্টার দ্বারাই সত্যকার শিষ্যভক্তগণ তাদের গুরুর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শন করে থাকেন।'

স্বামীজীর ওই নির্দেশেই প্রণব কন্যা সঙ্ঘ গঠনের মূল প্রেরণা।

স্বামীজীর এইরূপ উদাত্ত আহ্বানে মহিলা ভক্তদের মধ্য থেকে পাঁচজন শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের নিকট ত্যাগ জীবনযাপনের সম্মতি জানালেন পৃথক পৃথক ভাবে— তখনও তাঁদের পরস্পরের পরিচয় হয়নি। স্বামীজী তাঁদের কাশীধামে দুর্গাপূজার সময় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে দেখা করতে বললেন। কাশীধামে গেলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হয় এক স্বামীজীর কাছে তাঁরা স্ত্রী মঠ গঠনের সঙ্কল্প নেন।

১৯৭১ সালের ৪ জানুয়ারি শ্রীমৎ বেদানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি— পৌষ শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হয়।

স্বামীজী বললেন, সঙ্ঘের নাম প্রণবানন্দ সঙ্ঘ হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই বললেন— তোমরা সব কন্যারা, তাই নাম হোক— প্রণব কন্যা সঙ্ঘ। প্রণবানন্দের কন্যা বলেই তোমাদের সকলে চিনবে।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ব্রহ্মচারিণী দুজন সাদা থান পরতেন। একদিন বালিগঞ্জে গেলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সভাপতি পূজ্য বড়ো স্বামীজী— অদ্বৈতান্দজী মহারাজকে ডেকে বলেছিলেন, কুমারী মেয়েরা কেন সাদা থান পরবে, ওদের বলবে যেন লাল পাড়ের কাপড় পরে। এভাবেই সঙ্ঘের যাত্রা শুরু হয়েছিল পঞ্চকন্যাকে নিয়ে।

আচার্য প্রণবানন্দজী মহারাজের মাতৃশক্তি ভাবনা

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষ তার মায়ের সঙ্গে আচার্যদেবের কাছে গিয়েছিলেন— আচার্যদেব কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,— 'মেয়ে আর পুরুষ দুটো আলাদা জাতি, তেমন মেয়ে আমার কাছে আসুক, আমি তার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করব।'

মানুষের দৃষ্টি চাঞ্চল্যের কথা ও তজ্জনিত মানসিক দুর্বলতার কথা বলে ব্রহ্মচর্য, সংযম শিক্ষার কথা বলেছিলেন। মেয়েদের কলেজ যাওয়ার ও ডিগ্রিলাভের অতি আগ্রহ ও অদ্ভুত আধুনিকতা তাঁর মনোমতো ছিল না। আদর্শ নারীধর্ম যা, তার দিকে যাতে মেয়েদের মন আকৃষ্ট থকে, পবিত্র মাতৃধর্ম ও সতীধর্ম যাতে মেয়েদের মনকে উদ্বুদ্ধ করে, উন্নত আদর্শের দিকে তাদের পরিচালিত করতে পারে, এই দিকেই তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

একবার মাদারীপুর আশ্রমের উৎসবের সময় একদল মেয়ে কিছুক্ষণ যাবৎ আচার্যদেবকে ঘিরে বসে আছে তাঁর দর্শন কুটিরে। তিনি তাদের উপদেশ, সান্ত্বনা দিচ্ছেন নানাভাবে। স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর মনে চলছে তখন কঠোর বৈরাগ্য-বিচার। যোগবাশিষ্ঠের বৈরাগ্যপ্রকরণ ও শঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলী পড়ে নারীকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলে তিনি বিচার করে। ঠাকুর কেন এই মেয়েদের এতখানি প্রশ্রয় সে কতকটা ক্রোধ ও অনুযোগের ভাব নিয়ে প্রবেশ করলেন তদীয় দর্শন কুটিরে, আচার্যদেব সেভাব বুঝে তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিলেন মেয়েদের এবং পরমুহূর্তে স্বামীজীকে বললেন— 'মেয়েরাও মানুষ, তাদেরও জীবন গঠনের প্রয়োজন আছে, সমাজের অর্ধেকই তো তারা। ধর্মকে তো তারাই কতকটা বাঁচিয়ে রেখেছে। বিশেষত, পারিবারিক জীবনের আচার-বিচার ও সুখ-শান্তি তো তাদেরই উপর নির্ভর করে অনেকখানি, সুতরাং তাদের এত অনাদর উপেক্ষা করা যায়। কেমন করে... যাও তাদের সামনে কিছুক্ষণ বক্তৃতা কর।' আচার্যদেবের এই নির্দেশ শুনে স্বামীজী বুঝতে পারলেন— নারী জাতির প্রতি অবজ্ঞা করা অসমীচীন। ■

কালীপদ অভিলাষী রানি রাসমণি

অমিত ঘোষ দস্তিদার

হালিশহর হলো হাবেলি শহর যার প্রাচীন নাম ছিল কুমারহট্ট। হালিশহর সাধক রামপ্রসাদের ভূমি। রামপ্রসাদের মৃত্যুর মাত্র বারো বছর পর জন্মেছিলেন রাসমণি। রাসমণির জন্মস্থান হালিশহরের কোণাগ্রামে। তাঁরা ছিলেন বৈষ্ণব। হালিশহরের মাটি থেকে রাসমণির কৃষ্ণ-কালী অভেদবাণী অন্তরে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চেতনার উন্মেষের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল রামপ্রসাদী গান। গরিব কৃষক বাবা হরেকৃষ্ণ দাস, যিনি চাষের সঙ্গে ঘরামির কাজও করতেন। মা রামপ্রিয়া গরিবের সংসার যত্ন করে গুছিয়ে, প্রতিদিন অন্তত একজন অতিথি নারায়ণকে না খাইয়ে অন্নজল স্পর্শ করতেন না। রাসমণির বিয়ে হয়েছিল জানবাজারের জমিদার বাবু রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে।

রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র দাস মারা যান ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে।

রাজচন্দ্রের বয়স তখন ৫৩ বছর। রানি রাসমণির বয়স ৪৩ বছর। রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর তিনমাস আগে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ বছর বয়সের রামকৃষ্ণকে যখন রানি রাসমণি দেখেন তখন রানির বয়স ৬২ বছর। রাসমণি তখন লোকপ্রসিদ্ধা, লোকমাতা রানি রাসমণি। সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ তখন তাঁকে এক ডাকে চেনে। ইংরেজরা তাঁকে মানে এবং ভয় পায়।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাকিনটস অ্যান্ড বার্ন কোম্পানি দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরির কাজ শেষ করে। ১৮৫৫ সালের ৩১ মে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির তৈরির আগে-পরে রাসমণিকে অনেক অশান্তি, অনেক মামলা মোকদ্দমার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসমণি তাঁর লক্ষ্যপথে ছিলেন অবিচল। কোনো রাজ্য না চালিয়েও মানুষের কাছে তিনি ছিলেন রানিমা। দোর্দণ্ডপ্রতাপ এবং দেশব্যাপী খ্যাতিই ছিল তাঁর রাজ ঐশ্বর্য। অন্তরে ছিলেন এক দীনহীন ভক্তিমতী নারী।

গঙ্গার পূর্ব তীরে দক্ষিণেশ্বর। কলকাতা থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটি গ্রাম। দক্ষিণেশ্বরের আদি নাম ছিল শোণিতপুর। দেউলিপোতার বাণরাজা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এখানে শিবলিঙ্গ পেয়েছিলেন। রাজা মন্দির বানিয়ে শিব প্রতিষ্ঠা এবং নিত্য সেবা-পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাণরাজা সেখানে শিব পেয়ে জায়গাটির নাম দিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ঘাটে (বুড়োশিবতলা ঘাটে) মানুষের পূজাপ্রাপ্ত বুড়োশিবই হলেন বাণরাজার প্রতিষ্ঠিত শিব। ওখানেই ছিল রাজার নির্মিত মন্দির। রাসমণির মন্দির গড়ে ওঠার পর শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় মৃন্ময়ী ভবতারিণী মূর্তির চিন্ময়ী জগন্মাতায় আবির্ভাবের ফলে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা জগতে ছড়িয়ে পড়ায় দক্ষিণেশ্বর আরও গভীর অর্থবহ হয়ে ওঠে। দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই গঙ্গার লাগোয়া উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম মিলিয়ে বিশাল কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি জমি রাসমণি পেয়েছিলেন। পূর্ব মালিক ছিলেন জন হেস্টি সাহেব। গাছপালা ঘেরা জায়গাটির তখন স্থানীয় নাম ছিল 'সাহেবান বাগিচা'। জন হেস্টির কাছ থেকে রানি রাসমণি কুঠিবাড়ি-সহ গাছপালা ঘেরা জায়গাটি কেনেন। দক্ষিণেশ্বরের দ্বাদশ শিব মন্দিরের রাসমণি প্রতিষ্ঠিত নানা শিব-রূপ হলো— যোগেশ্বর শিব, যাঁড়েশ্বর শিব, জটিলেশ্বর শিব, নকুলেশ্বর শিব, নাকেশ্বর শিব, নির্যরেশ্বর শিব, জঙ্গেশ্বর শিব, জলেশ্বর শিব, জগদীশ্বর শিব, নাদেশ্বর শিব, নন্দীশ্বর শিব ও নরেশ্বর শিব। অন্যান্য জাগ্রত মূর্তিগুলি হলো জগদীশ্বরী কালী, শ্রীশ্রী জগদীশ্বর মহাকাল, শ্রীশ্রী জগমোহিনী রাধা, শ্রীশ্রী জগন্মোহন কৃষ্ণ। রানি রাসমণি ভবতারিণী মন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির এবং অন্যান্য সমস্ত কিছুর সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা করে গেছেন।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি রানি রাসমণি প্রয়াত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রথম এসেছিলেন মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন, ১৮৫৫ সালের ৩১ মে। তার কয়েকদিনের মধ্যেই দাদা রামকুমারের ঝামাপুকুর টোল উঠে গেলে দাদার সঙ্গে মন্দির চত্বরেই বাস করা শুরু করেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় বাস করেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি কামারপুকুর, জয়রামবাটী, নদীয়া, খুলনা, দেওঘর, বারাণসী, বৃন্দাবন ইত্যাদি জায়গায় গিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে শেষবারের জন্য চলে এসেছিলেন ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫, ১২ আশ্বিন ১২৯১।

জ্যৈষ্ঠে ফলহারিণী কালীপূজা, কার্তিকে শ্যামাপূজা, মাঘমাসে রটন্তী কালীপূজা সম মর্যাদা এবং সাড়ম্বরে দক্ষিণেশ্বরে আজও অনুষ্ঠিত হয়। রানি রাসমণির প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির আজ আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে উদ্ভাসিত। সারা বিশ্বের মানুষ আসেন এখানে। দক্ষিণে কালীঘাট, উত্তরে দক্ষিণেশ্বর বাঙ্গালির আত্মিক টানের এই দুই স্থান অন্তরের শান্তি খুঁজে দিতে পারে। কত মানুষ আজও আসেন এই দক্ষিণেশ্বরে। পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সাপ্তাহিক সোমপ্রকাশ ১২৬২ বঙ্গাব্দের ২২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় লিখেছিল— 'জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যশীলা শ্রীমতী রানি রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথি যোগে দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র নবরত্ন ও মন্দিরাদিতে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ওই দিবস তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই পুণ্যকর্ম উপলক্ষ্যে রানি রাসমণি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি অনেকানেক স্থানে দেবালয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ প্রকার বৃহৎ নবরত্ন ও নাটমন্দির কেহই করেন নাই। জগদীশ্বর পুণ্যবতী রাসমণিকে যে প্রকার অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, সেই প্রকার মহৎ অন্তঃকরণও দিয়াছেন। তিনি স্বীয় অতুলধনের সার্থকতা করিলেন, এই অবনীমণ্ডলে তাঁহার চিরকীর্তি সংস্থাপিত রহিল।'

রাসমণির আমন্ত্রণ পেয়ে সারা দেশ থেকে ব্রাহ্মণরা এসেছিলেন প্রতিষ্ঠা-উৎসবে যোগ দিতে। নদীয়া, ভাটপাড়া, মূলাজোড়, চাটগাঁ, নোয়াখালি, বিক্রমপুর, কাশী, পুরী, পুণা, মাদ্রাজ, কনৌজ, মিথিলা থেকে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ এসেছিলেন। এই লক্ষ ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো কুড়িয়ে নিজের বাড়িতে সযত্নে রেখেছিলেন রাসমণি। তপঃশুদ্ধ জীবনে বিশাল ব্যক্তিত্বের আড়ালে থাকা এক ভক্তিমতী নারী যাঁর ঐশ্বর্য, তেজ, দাপট থাকা সত্ত্বেও আসল রূপ ছিল শুদ্ধাচারিণী, তপঃক্লিষ্টা, দীনা রমণীরূপী কালীপদ অভিলাষী শ্রীরাসমণি দাসী— যা আজও বিধৃত হয়ে আছে তাঁর নিজের নাম স্বাক্ষরে, তাঁর সিলমোহরে এবং সবকিছু ছাপিয়ে দক্ষিণেশ্বরের কীর্তিতে, এমনকী মানুষের হৃদয়ে। □

রামেন্দ্র রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ

দীপক খাঁ

গত ২২ জানুয়ারি ভারতের প্রেমাস্পদ শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির উদ্বোধন করেছেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেটা অনেকের কাছেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে— অবশ্যই নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী এ ব্যাপারে হবেন গৌণ কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হবেন মুখ্য। 'অস্ত্যু ত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ' —মহাকবি সেই কত যুগ আগে লিখে গিয়েছেন অমর পঙ্‌ক্তিটি। যেখানে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে মহাসাগর, সেই স্থানে কোন পৌরাণিক যুগে ভরত নামে এক প্রজাবৎসল রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর নামেই এই বিস্তৃর্ণ ভূখণ্ডের নাম হলো ভারতবর্ষ। এখানকার দুকূল ছাপানো নদী, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা শস্যক্ষেত্র আর শ্যামল বনানী যুগ যুগ ধরে তপস্বীদের আশ্রয় স্থল তথা সাধনার ক্ষেত্র। এই ভূখণ্ডেই একদা উচ্চারিত হয়েছিল বেদের সামগান তথা প্রণাম মন্ত্র। এখানেই হাজার বছরের

আধ্যাত্মিক উপলব্ধি— যা এই দেশের প্রাণ তথা অন্তরাত্মা। এখানের মৃত্তিকাতেই সর্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বরের সঙ্গেই চলেছে সাকার উপাসনা— সীমার মাঝে অসীমের খোঁজ। এই সগুণ ঈশ্বরের উপাসনার ফলস্বরূপ শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য, রামায়েত সম্প্রদায়গুলি। ঈশ্বর সম্পর্কে কোনোরূপ চিন্তা না থাকলে— মদ, মাংস ও সিগারেট নেশাকারী রূপে দেখা একদল মানুষ অর্থাৎ মানহুঁশ না থাকাটাই অবাঞ্ছিত রূপে দেখাটা যাঁদের তপস্যা, তাঁদের মতো গণ্ডমূর্খদের দিকে না তাকানোই শুভ— এ ব্যাপারে আর কী করা যায়!

রামায়েত সাধুরা ঈশ্বরকে পুরষোত্তম রামরূপে, বিশেষ করে রামলালা, অর্থাৎ শিশুরাম রূপে ভজনা করে থাকেন। বাৎসল্য ভাবে ঈশ্বরের সন্ধান। জ্ঞানমার্গ ছেড়ে ভক্তির পথ অবলম্বনকারী রূপে। ভক্তকবি তুলসীদাস যেরূপ বলেছেন— যো রাম দশরথ কা বেটা বহী রাম ঘট ঘটমে লেটা, বহী রাম জগৎ পসেরা, বহ রাম হ্যায় সবকে নিয়ারা। আমাদের এই বঙ্গপ্রদেশে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যখন কাশীপুর বাগানে শরীর যায় যায়, তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিছানার পাশে মনে মনে ভাবছিলেন— এই সময় যদি বলতে পার— 'আমিই ভগবান' তবে বিশ্বাস করব— তুমি সত্যসত্যই ভগবান। তখন শরীর যাবার দুদিন বাকি, হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে বললেন— 'যে রাম, যে কৃষ্ণ— সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ। তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।'। এই কথা শুনে নরেন অবাক হয়ে গেলেন। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখলে— 'শ্রীরামকৃষ্ণ'কে বলা যায় বহুরূপী দৃষ্টিকোণে— শ্রীরামকৃষ্ণ। এটা তাঁর প্রতি 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা'— যা ভিন্ন ভিন্ন সাধক ও শিষ্যরা বলে গেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামের ইষ্টদেবতা ছিলেন ভগবান রামচন্দ্র। তিনি একদিন গ্রামান্তর থেকে ফিরবার কালে পথপার্শে এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করবার সময় নিদ্রাবিষ্ট হন। তখন ক্ষুদিরাম স্বপ্নে দেখেন তাঁর ইষ্টদেব রঘুবীর রামচন্দ্র বালকবেশে তাঁর সম্মুখে এসে একটা স্থানবিশেষ নির্দেশ করে বলেন, 'আমি এখানে অনেকদিন অযত্নে, অনাহারে আছি। আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চল। তোমার সেবা গ্রহণ করতে আমার একান্ত অভিলাষ হয়েছে।' ক্ষুদিরাম নিদ্রাভঙ্গে সে স্থানে গিয়ে একটা শালগ্রাম শিলা পান এবং সযত্নে গৃহে এনে প্রতিষ্ঠা করেন।

ক্ষুদিরাম অতি দরদের সঙ্গে শালগ্রামরূপী রঘুবীরের নিত্য সেবা করতেন। একদিন তাঁর সাধ হলো প্রভুকে মালা পরাতে। তিনি পুষ্প চয়ন করে মালা গেঁথে পূজাসনে বসলেন। রঘুবীরকে স্নান করিয়ে আসনে বসবার পর ক্ষুদিরাম চোখ বুজে ধ্যান শুরু করলেন। গদাই নিজেই সেই মালা পরলেন। রামকৃষ্ণ পুঁথিতে অক্ষয় সেন লিখছেন :

'রই করি জনকেরে ডাক দিয়া কন।
দেখ না গো রঘুবীর সেজেছে কেমন।।
আমি সেই রঘুবীর দেখনা গো চেয়ে।
কেমন সেজেছি মালা—চন্দন পরিয়ে।।

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর ইষ্ট কে ছিলেন বলা মুশকিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার আগে তিনি মা জগদম্বার আদেশ পেয়েছিলেন, তন্ত্রোক্ত শক্তির উপাসনাতে সিদ্ধ হয়েছিলেন, বৈষ্ণবোক্ত ভক্তিমার্গের উচ্চ সাধিকা ছিলেন, অথচ তিনি ভ্রমণকালে তাঁর চির-আরাধিত রঘুবীর শিলা বহন করে নিয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনের পর কী হয়েছিল তা স্বামী সারদানন্দ বর্ণনা করেছেন— 'ব্রাহ্মণী নিজ কণ্ঠগত রঘুবীর শিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা, চাল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া পঞ্চবটীতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন। রন্ধনান্তে রঘুবীরের সামনে খাদ্যাদি রাখিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অভূতপূর্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন। ঠাকুর ওই সময় প্রাণে প্রাণে আকৃষ্ট হইয়া অর্ধবাহ্য অবস্থায় সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দৈবশক্তি বলে পূর্ণাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণী-নিবেদিত খাদ্যসকল ভোজন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন। ব্রাহ্মণী তখন জননীর ন্যায় আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, 'বেশ করিয়াছ, বাবা ওইরূপ কার্য তুমি কর নাই, তোমার ভিতর যিনি আছেন তিনি করিয়াছেন, ধ্যান করিতে করিতে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আমার পূর্বের বাহ্যপূজার আবশ্যকতা নাই, আমার পূজা এতদিনে সার্থক হইয়াছে। অতঃপর দেবপ্রসাদরূপ উক্ত ভোজনাবশিষ্ট গ্রহণ করিলেন এবং বহুকাল পূজিত নিজ রঘুবীরশিলাটিকে গঙ্গা বক্ষে বিসর্জন করিলেন।'

বাৎসল্যভাবে সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ জটাধারী নামক এক রামায়েত সাধুর কাছে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হন। জটাধারীর ইষ্ট রামলালার অষ্টধাতুর বিগ্রহ কীভাবে ঠাকুরের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের মতো আহার, শয়ন, স্নান, দৌড়ঝাঁপ করছে তা সত্যই বিশ্বাসজনক। ঠাকুরও মা কৌশল্যার ন্যায় বাৎসল্যরসে আপ্লুত হয়ে রামলালার সেবা করছেন। তারপর রামলালার সঙ্গে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ যোগ দেখে জটাধারী একদিন সজল নয়নে ঠাকুরের কাছে এসে বলল, 'রামলালা আমাকে কৃপা করে প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে যেমন ভাবে দেখতে চাইতাম তেমনি করে দর্শন দিয়েছে ও বলেছে, এখান থেকে যাবে না; তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে চায় না! আমার এখন আর মনে দুঃখ-কষ্ট নাই! তোমার কাছে ও সুখে থাকে আনন্দে খেলাধুলা করে, তাই দেখেই আমি আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই! এখন আমার এমনটা হয়েছে যে ওর যাতে সুখ, তাতেই আমার সুখ! সেজন্য আমি এখন একে তোমার কাছে রেখে অন্যত্র যেতে পারব। তোমার কাছে সুখে আছে ভেবে ধ্যান করেই আমার আনন্দ হবে।' —এই বলে রামলালাকে ঠাকুরকে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলে। সেই অবধি রামলালা দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন।

স্বামী শান্তানন্দ তাঁর স্মৃতিকথাতে লিখেছেন : একদিন ঠাকুরের কথা প্রসঙ্গে রামলাল দাদা (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) আমাকে বলিয়াছিলেন, অযোধ্যায় একজন যুবক রামায়েত সাধু বুঝতে পারলেন যে ভগবান আবার ধরাধামে (পূর্বাঞ্চলে) অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি তাঁকে দেখবার জন্য অযোধ্যা হতে পদব্রজে রওনা হলেন। আসতে আসতে বাংলাদেশে এসে শুনলেন যে, কলকাতার নিকট রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন বড়ো সাধু আছেন। সন্ধান করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই জিজ্ঞেস করছেন, তিনি (রামকৃষ্ণ পরমহংস) কোথায়? কালীবাড়ির লোক তাঁকে বললে যে, এই কয়েকদিন হলো তিনি শরীর ত্যাগ করেছেন। এই কথা শুনে সাধুটি, 'হম্ এত্না তকলিব করকে অযোধ্যামে উন্‌কো ওয়াস্তে পয়দল আঁতে হ্যাঁয় আউর ও শরীর ছোড় দিয়া?' এই বলে কাঁদতে লাগলেন। ওঁকে কালীবাড়ির সদাব্রত হতে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে, কিন্তু তিনি কিছু না খেয়ে ২-৩ দিন পঞ্চবটীতে পড়ে রইলেন। এ সময়ে একদিন রাতে তিনি দেখেন নহবতের পাশে বকুলতলার ঘাট দিয়ে ঠাকুর গঙ্গা থেকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠলেন, উঠে ওঁকে বললেন, 'তুই এ কদিন খাসনি, এই পায়েস এনেছি খা।' এই বলে ওঁকে খাওয়ালেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে আমি পঞ্চবটীতে গিয়ে দেখি সাধুটির খুব আনন্দ। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এতদিন বিমর্ষ ছিলে, হঠাৎ তোমার এত আনন্দ দেখছি কেন?' সাধুটি সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন এবং ঠাকুর যে মাটির সরাতে করে ওঁকে পায়েস খাইয়েছিলেন সে সরাটিও দেখালেন। রামলালদাদা এই সরাখানা বহুকাল যত্ন করে রেখেছিলেন, তারপর কীভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি— স্বামী চেতনানন্দ। ২. রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে— স্বামী চেতনানন্দ। ৩. কে বলে ঠাকুর নেই! —অমিতাভ দাশগুপ্ত।

বাংলাদেশে নির্বাচন মানে হিন্দু নির্যাতন, বাড়িঘর-মন্দিরে হামলা

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। বাংলাদেশে নির্বাচন মানে হিন্দু নির্যাতন, হত্যা, বাড়িঘর-মন্দিরে হামলা ও অগ্নিসংযোগ, নারীধর্ষণ। গত ৭ জানুযারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাই আবার প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলা-নির্যাতন, জায়গাজমি দখল অনেকটা স্বাভাবিক 'নিয়মে' পরিণত হয়েছে। নির্বাচন এলে, তা সে জাতীয় সংসদই হোক কিংবা স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচই হোক, নির্যাতন-হামলা আরও ব্যাপক রূপ নেয়।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রচারণার সময় হামলা শুরু হয়েছিল, এখনও চলছে। এবারের নির্বাচনে কোনো বিরোধী দল অংশ নেয়নি, হয়েছে একতরফা নির্বাচন। বলা যায় শাসক আওয়ামি লিগ বনাম স্বতন্ত্র নামে আওয়ামি লিগ, সঙ্গে 'গৃহপালিত' বিরোধী কয়েকটি দল। প্রধান বিরোধী শক্তি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং একাত্তর সালের যুদ্ধাপরাধী-ঘাতক জামায়াতে ইসলামি-সহ বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। তারা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছিল সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে। তাদের যুক্তি, শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। অন্যদিকে আওয়ামি লিগ বলেছে, সরকার কোনোভাবেই সংবিধানের বাইরে যেতে পারে না। সংবিধানে ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিধান রয়েছে। তবে নব্বইয়ের দশকে আন্দোলনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিধান ছিল। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসার পর আদালতের রায় এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে। সেই নির্বাচনে কিছু হামলার ঘটনা ঘটলেও পরবর্তী প্রত্যেক নির্বাচনে হিন্দুরা ব্যাপক হামলার শিকার হয়েছেন। অথচ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানে যে নির্বাচন স্বাধীন বাংলাদেশের ভিত গড়েছিল, আওয়ামি লিগ নিরঙ্কুশ জয় পায়। হিন্দুরা কিংবা অন্য কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সেই নির্বাচনে আক্রান্ত হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশে নির্বাচন, তা সে জাতীয় সংসদ নির্বাচনই হোক কিংবা স্থানীয় পর্যায়ের কোনো নির্বাচন হোক, হিন্দুরা নির্যাতন ও হামলার লক্ষ্য হয়েছে। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে।

সংখ্যালঘু সমাজ বিশেষ করে হিন্দুরা ভোট দিলেও হামলার শিকার হয়, না দিলেও আক্রান্ত হয়। আওয়ামি লিগকে ভোট দিলে বিএনপি-জামায়ত হামলা করে। বিএনপি-কে ভোট দিলে (জামায়াতে ইসলামিকে সংখ্যালঘুরা কখনো ভোট দেয় না) আওয়ামি লিগ ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাড়িঘর-মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর হয়, আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, নারীরা নির্যাতিতা হন। ভোট দেওয়ার অপরাধে বাড়িঘর ছাড়তে হয়, জায়গাজমি বেদখল হয়ে যায়।

এবারের অর্থাৎ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেহেতু বিএনপি-জামায়াত বর্জন করেছে এবং বাধা দেয়নি, আশা করা গিয়েছিল নির্বাচন হবে শান্তিপূর্ণ, হিন্দুরা আক্রান্ত হবে না। কিন্তু সে আশায় জল ঢেলে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামি লিগের হাতেই হামলা-নির্যাতনের শিকার হয়েছে হিন্দুরা এবং সংখ্যালঘু অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও। নির্বাচনে প্রার্থী দেয় আওয়ামি লিগ। বিরোধীরা যেহেতু আসেনি এবং এই নির্বাচন ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন-সহ বহির্বিশ্বের তীক্ষ্ণ নজর ছিল, তাই ভোটকেন্দ্রে উপস্থিতি বাড়াতে আওয়ামি লিগ সভাপতি শেখ হাসিনা দলের মনোনয়ন যারা পাননি, তাদেরও ভোটে দাঁড়াতে বলেন। এই ঘোষণার পর মনোনয়ন বঞ্চিত আওয়ামি লিগ

কুষ্টিয়ার কুমারখালির পীতাম্বরবসী গ্রামে হিন্দু বাড়িতে হামলার চিহ্ন।

ফঃ ৫

নেতারা স্বতন্ত্র হিসেবে দাঁড়ান। অন্যদিকে গৃহপালিত বিরোধী দল জাতীয় পার্টিকে ২৬টি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়, যেখানে আওয়ামি লিগের প্রার্থী দেওয়া হয়নি। এছাড়া আওয়ামি লিগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের দুই দলকেও (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং ওয়ার্কার্স পার্টি) দুটি করে আসন ছেড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সবাই আওয়ামি লিগ ও মিত্রদের প্রার্থী। এক কথায় মিলেমিশে নির্বাচন। তাই ভাবা হয়েছিল নির্বাচন সহিংসতা ছড়াবে না।

কিন্তু নির্বাচনে বিশেষ করে হিন্দুরা আক্রান্ত হলেন আওয়ামি লিগের মনোনয়নপ্রাপ্ত নৌকা প্রতীকের প্রার্থীদের ভোট দিয়ে, স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামি লিগ নেতাদের ভোট দিয়ে, আওয়ামি লিগের গৃহপালিত ও মিত্রদের ভোট দিয়ে। কারা হামলা করলেন? নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে স্বতন্ত্র আওয়ামি লিগ প্রার্থীদের আক্রোশের শিকার হলেন, স্বতন্ত্র আওয়ামি লিগ নেতাদের ভোট দেওয়ায় আওয়ামি লিগ হামলামি লিগ হামলা করলো, বাড়িঘর-মন্দিরে আগুন দিল। মহিলারা ধর্ষণের শিকার হলেন। আওয়ামি লিগের গৃহপালিত ও মিত্রদের ভোট দেওয়ায় আওয়ামি লিগ ও স্বতন্ত্র আওয়ামি লিগ ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই হামলা এখনো চলছে, কয়েকটি জেলায় হিন্দু পাড়া এখনো জনশূন্য। নির্বাচনে ভোট দিয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে অনেক পরিবারকে। এই প্রতিবেদন তৈরির সময় পর্যন্ত অনেকে ঘরে ফেরেননি। এই হলো ভোট দেওয়া পরিণতি, যে ধারা চলে আসছে সত্তরের দশক থেকে।

ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামি লিগের মনোনয়ন পাওয়া বনাম মনোনয়ন না পাওয়া কিন্তু অনুমতি পাওয়া আওয়ামি লিগ নেতাদের এই নির্বাচনে যখন এই অবস্থা ধর্মনিরপেক্ষতা-বিরোধী বিএনপি-জামায়াত ও অন্যান্য বিরোধী দল এলে অবস্থা কী দাঁড়ায় তা ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়। ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিএনপি-জামায়াতের নারকীয় তাণ্ডবে বহু হিন্দু পরিবারকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আওয়ামি লিগকে ভোট দেওয়ার অপরাধে প্রায় সারাদেশেই বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলা চালানো হয়, লক্ষ লক্ষ বাড়িঘর লুটপাটের পর পুড়িয়ে দেওয়া হয়, কয়েক হাজার মহিলা ধর্ষণের শিকার হন, যাদের মধ্যে শিশু-কিশোরী-যুবতী ছাড়াও বয়স্করাও ছিলেন। হত্যার ঘটনা ঘটে। মন্দিরে আগুন দেওয়ার পর নারকীয় উল্লাসে প্রতিমা ভাঙা হয়।

এই হামলার পর সংবাদপত্রে কয়েকটি ঘটনা প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও স্থান করে নিয়েছিল। সিরাজগঞ্জে এক কিশোরীকে কয়েকজন বিএনপি কর্মী ধর্ষণের জন্যে হামলে পড়লে তার মা হাতে-পায়ে ধরে তাদের বিরত করতে না পেরে মিনতি জানিয়েছিল, এক-একজন করে এসো বাবা। মেয়েটা বড্ড ছোটো। রংপুরে এক বৃদ্ধা পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের করুণকণ্ঠে বলেছিলেন, হিন্দুদের ভোট দেওয়াটা নিষিদ্ধ করার কথা লেখো বাবা। ভোট দেওয়ার অধিকার না থাকলেই তো আমরা বাঁচতে পারি। এই সাংবাদিকদের মধ্যে বিবিসি ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা ছিলেন।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের ৩৫০ আসনের মধ্যে ৩০০ আসনে নির্বাচন হয়। বাকি ৫০ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। নির্বাচিত সাংসদরা এই ৫০ জনকে মনোনীত করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৯টিতে নির্বাচন হয়। আওয়ামি লিগ পেয়েছে ২২৩, স্বতন্ত্র নামের আওয়ামি লিগ প্রার্থীরা পেয়েছেন ৫৮ আসন, প্রকৃত স্বতন্ত্র ৪ আসন, জাতীয় পার্টি ১১, ওয়ার্কার্স পার্টি ১, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১ ও কল্যাণ পার্টি ১। এটি আসনে নির্বাচন বন্ধ ছিল এক প্রার্থীর মৃত্যুতে। এদের মধ্যে ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নির্বাচন করেছে আওয়ামি লিগের নৌকা প্রতীক নিয়ে। বলা যায়, এই নির্বাচন কার্যত আওয়ামি লিগ পরিবারের নির্বাচন। তার মধ্যেই নির্বাচনে সহিংসতা হলো, আর এই সহিংসতায় প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে হিন্দু সমাজ, বরাবরের মতোই।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ অভিযোগ করেছে সংগঠনের কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেলের তথ্য অনুযায়ী বেশ কিছু প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক বক্তব্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করে অকথ্য ভাষায় ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় হিন্দুদের হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে তারা যেন ভোট দিতে না যায়, আবার কোথাও বলা হয়েছে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে বিশেষ মার্কায় ভোট দিতে হবে নইলে খবর আছে। সবার হিসেব রাখা হচ্ছে। হুমকিদাতাদের নির্দেশানুযায়ী কেন্দ্রে গেলে বা না গেলে পরবর্তীতে দেখে নেওয়া হবে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে নির্বাচনী মিছিলে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে প্রকাশ্যে হুমকি-ধমকি।

নির্বাচনের সুযোগে হামলা, জমি দখল

গত ৯ জানুয়ারি ঠাকুরগাঁওর রাণীশংকৈল উপজেলার বাচোর ইউনিয়নের বাপড়টলা কাটাবাড়ি গ্রামের শ্মশানে শামসুল হক-সহ ৫ জন দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে বিভিন্ন জাতের ১০০ গাছ, ৬টি ধাম, ৭টি মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুর করেছে। প্রত্যক্ষদর্শী সুবল রায় ও পলাশ চন্দ্র জানান, রাতে মাছ ধরে ফেরার সময় তারা এই ঘটনা দেখতে পান। বাচো ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, এই নিয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

গত ৯ জানুয়ারি সাতক্ষীরার দেবহাটার নোয়াপাড়ার সুশান্ত মণ্ডলের জমি জবরদখল করা হয়েছে। রামনাথপুর গ্রামের মৃত হোসেন আলি সরদারের ছেলে স্থানীয় বিএনপি নেতা আকবর আলি এই জমি দখল করেন।

গত ৭ জানুয়ারি নওগাঁ'র ধামইরহাট উপজেলা রামরাপুর ইউনিয়নের তেলিপাড়া গ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অনিমা হেমরম (বয়স ১৯)-কে বেধড়ক মারপিট করা হয়।

হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার বুল্লা ইউনিয়নের চরগাঁও গ্রামের বাবুল মিয়ার সঙ্গে হেলাকান্তি গ্রামের মহালাল দাশের ছেলে বধুলাল দাশের তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাকবিতণ্ডা হয়। গত ১০ জানুয়ারি পার্শ্ববর্তী বড়কান্দি গ্রামের গানের আসর থেকে ফেরার পথে বধূলাল দাশকে কুপিয়ে হত্যা করেছে বাবুল মিয়া তার সহযোগীদের নিয়ে। হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় এই নিয়ে মামলা এজাহার

করা হয়েছে।

গত ৭ জানুয়ারি রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানার পাট্টা ইউনিয়নের বিলজোনা গ্রামের বিমান বিশ্বাসের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে পাট্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রব মুনা বিশ্বাসের ছেলে সাব্বির বিশ্বাস-সহ আরও কয়েকজন। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ ও সামাজিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে হামলাকারীরা ভোটের সুযোগে এই হামল চালায়। তারা বিমান বিশ্বাসকে না পেয়ে তার পিতা অজিত বিশ্বাসকে মারধর ও গালিগালাজ করে, জ্যাঠাতো ভাই সুরঞ্জন বিশ্বাসকে অস্ত্র দিয়ে কোপায় এবং বিমানের মা সারথী বিশ্বাসকে এলোপাথাড়ি পিটিয়ে স্বর্ণালংকার-সহ নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

গত ১০ জানুয়ারি নাটোরের সিংড়া উপজেলার ৯নং তাজপুর ইউনিয়নের হুলহুলিয়া গ্রাম থেকে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ভাদুড়ি পাড়ায় বেড়াতে এসে এক হিন্দু কিশোরীকে ধর্ষণের চেষ্টার করা হয়েছে। ঘটনা সংশ্লিষ্টতায় ভাদুড়ি গ্রামের তিন বখাটে আরিফ আলি, হাসান ও আলি ও সুমন আলিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে চা-গবেষণা কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক ইসমাইল হোসেনের বিরুদ্ধে শ্যামল গোয়ালার পরিবারকে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। শ্যামলদের বংশপরম্পরায় পূর্ব- পুরুষদের থেকে পাওয়া জমিজমা মৌরসি সূত্রে তারা ভোগ দখল করে এলেও ইসমাইল হোসেন ভূমির ভূয়া দলিল তৈরি করে তা দখল করার ষড়যন্ত্র করে। শ্যামল ২০১৫ সালের ১৩ জুলাই তারিখে রেকর্ড সংশোধনের জন্য ল্যা-সার্ভে-২৩০/২০১৫ নং মামলা দায়ের করেন। শুনানির পর ল্যা-এ-সার্ভে ট্রাইব্যুনাল আদালত ৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে শ্যামল গোয়ালার পক্ষে রায় দেন। রায়ের পর ১০ ডিসেম্বরে ওই জমিতে গৃহ নির্মাণ করতে গেলে ইসমাইল হোসেন ও তার সহযোগীরা লাঠিসোটা নিয়ে হাজির হয়ে নির্মাণ কাজে বাধা ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ভীত শঙ্কিত পরিবরটি প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

গত ৮ জানুয়ারি ঝিনাইদহে কালীগঞ্জ উপজেলার কোলা ইউনিয়নের বাইশা গ্রামে হিন্দুদের ওপর হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট চালনো হয়েছে। এই হামলার পর নির্মল বিশ্বাস বাদী হয়ে গত ১১ জানুয়ারি কালীগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার সদর ইউনিয়নের বিদ্যাধর গ্রামের প্রভাবশালী শিল্পপতি তাজমিনউর রহমান তুহিন স্থানীয় হিন্দুদের জমি জবরদখল করে ভোগ করে আসছেন। গত ১৫ জানুয়ারি তিনি অনুমতি না নিয়ে গ্রামের ফসলি জমি স্কাভেটের মাধ্যমে পুকুরে রূপান্তর করেছেন। বিদ্যাধর গ্রামের দয়াল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, তাজমিনউর রহমান তুহিন আমার বাড়ির পাশের মানুষ, আমি একমাত্র সম্বল কৃষিজমি চাষ করে খেতাম। সেটাও আমাকে ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে। সদর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন বুলবুল এই জবরদখলের কথা স্বীকার করেন। তিনি অবশ্য বলেন, তিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে অন্যায় জবরদখল নিয়ে কথা বলবেন।

ময়মনসিংহ জেলা সদর ও ভালুকা উপজেলায় হিন্দুদের দুটি জুয়েলারির দোকানে লুট হয়েছে। জানা গেছে, এতে প্রায় অর্ধ কোটি টাকার সোনার অলংকার নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এক দোকানের মালিক রিপন সেন জানান, গত ১৭ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টায় নগরীর ৩২ নম্বর বাসাবড়ি রোড ট্রানকপট্টি এসএস কমপ্লেক্সের কিরণ জুয়েলার্স ৩২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩০ ভরি সোনা লুট হয়েছে। ৬/৭ জন দুর্বৃত্তের দল এই লুট চালায়। এর আগে ১০ জানুয়ারি ভালুকা উপজেলার কাচিনা ইউনিয়নের বাটাজোর বাজারের আঙ্গারগাড়া সড়কে রতন কর্মকারের হৃদয় অ্যা-সুজয় জুয়েলার্সে একই কায়দায় লুট হয়েছে। এই দোকান থেকে ২০ ভরি সোনা ও ১০০ ভরি রূপা লুট হয়েছে।

গত ১৬ জানুয়ারি বরিশালের উজিরপুর উপজেলার শোলক গ্রামে শ্রীশ্রী নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমে হামলা করে, মন্দিরের গেট ভেঙে পুজার সরঞ্জাম, কাঁসার, থালা-বাসন ও ঘট, পিতলের কলস, আসবাবপত্র-সহ মন্দিরের দানবাক্সের নগদ টাকা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

গত ১৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলা ঘারিন্দা ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের পয়লা গ্রামের কালী মন্দিরের নাটমন্দিরে শ্রীশ্রী মহানামযজ্ঞ হরিনাম সংকীর্তন চলাকলে একদল স্থানীয় সশস্ত্র দুর্বৃত্ত মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও নির্যাতন চালায়। আশরাফ ও আলামিনের নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা প্রসাদ খাওয়ার অজুহাতে মন্দিরে ঢুকে ভক্তদের ওপর হামলা করে। এই ঘটনার কিছু সময় পর পুনরায় ৫০/৬০ জনের একটি সশস্ত্র দল মন্দির সংলগ্ন হিন্দুপাড়ায় বিভিন্ন বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর করে। হামলায় ১৫ জন নারী-পুরুষ আহত হয়। গুরুতর আহত ৫ জনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গত ১৭ জানুয়ারি বগুড়ার ধুনটি উপজেলার মথুরামপুর ইউনিয়নের ছাতিয়ানি গ্রামে জোরপূর্বক জমি ক্রয়কে কেন্দ্র করে চায়না রানি ও তার ছেলে লিটন চন্দ্র দাসের ওপর হামলা করা হয়। ৮ বছর আগে চায়না রানি ও তার ভাসুর গোকুল চন্দ্র মোট ২৫ শতাংশ জমি বিক্রি করেন প্রতিবেশী আবু বক্কর সিদ্দিকের কাছে। অবশিষ্ট জমিতে চায়না রানি মন্দির স্থাপন ও গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করে আসছেন।

পরবর্তীতে আবু বক্কর সিদ্দিক এই জমিও বিক্রির জন্য চায়না রানির ওপর চাপ দিলে তিনি তা বিক্রয়ে অসম্মতি জানান। তৎপরবর্তীতে আবু বক্কর সিদ্দিক, তার ছেলে আবু তালেব, ভাতিজা শহীদুল ১০/১২ জন লোক নিয়ে চায়না রানির বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলা চালায়, ভাঙচুর করে। মারধোর করে পরিবারের সদস্যদের। এই নিয়ে থানায় মামলা রুজু করা হলে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গত ২১ জানুয়ারি গেপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলার ভাড়াশুর ইউনিয়নের নলডাঙ্গা গ্রামে নন্দিনী বিশ্বাস (বয়স ৯) নামের চতুর্থ শ্রেণীর স্কুলছাত্রীকে হত্যা করা হয়েছে। শিশুটির বাবা বিজন বিশ্বাস জানান, তিনি এবং তার স্ত্রী সকালে বেরিয়ে যান, শুধু মেয়েটি বাসায় ছিল। □

বাঙ্গালির ইতিহাস, বিস্মৃত সমৃদ্ধির এক পুঙ্খানুপুঙ্খ ডায়েরি

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘সাহিত্য চলচ্চিত্রের সহযাত্রা’ বইটি এক কথায় এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো এক ভিন্ন স্বাদের রচনা সমাহার। যা পাঠককে ক্লান্ত হতে দেয় না। কোনো এক ম্যাজিকাল শক্তিতে আপনা থেকেই পৃষ্ঠা যত অগ্রসর হয় তত আবিষ্কার হয় তথ্যের আকর, বাঙ্গালির খণ্ড খণ্ড ইতিহাস, উপলব্ধি করি কত কী আমরা ভুলে যাচ্ছিলাম। সুব্রতবাবু তাঁর বইয়ে সেই সব অচর্চিত সাহিত্য ও সিনেমার Anecodotes-এর এমন এক কোলাজ উপহার দিয়েছেন যা সংগ্রহে রাখার দাবিদার। বইতে রাজশেখর বসুর নিবন্ধে যেমন লেখক উল্লেখ করেছেন বিরিঞ্চিবাবার ক্ষেত্রে— ‘চোঁ’ করে জল শুকিয়ে গেল। ঠিক তেমনই ‘চোঁ’ করে এই বই পড়ে ফেলা যায়। অসংখ্য শব্দ ঝংকারে যেন প্রাণ আলেখ্য রচিত।

উদাহরণে বলা যায়— লেখকের ব্যবহৃত একটি বাক্য (পৃষ্ঠা-১৯) ‘তাঁর ব্যঙ্গই মধুর তিরস্কারধর্মী’ পাঠকের মনে দাগ কাটে। এবং সাহিত্য অংশে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে ‘বাইপাস সার্জারি’ লেখক কমলকুমারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণিত রূপে। তাঁর ‘লালজুতো’ কিংবা ‘মধু’-র কথা স্মৃতি থেকে জাগ্রত করলেন সুব্রতবাবুর কলম। সুব্রতবাবুর বইটিও যেন কমলকুমারের ভাষায় ‘এখনও মায়া রহিয়া গেল।’ লেখক তাঁর মুনশিয়ানাতেই উল্লেখ করেছেন কমলকুমার ও জীবনানন্দের সাদৃশ্য; যাঁরা চিত্ররূপময়তার পূজারি। কখনও সাহিত্য অংশ পড়তে পড়তে পাঠক অনায়াসে চলচ্চিত্রের পথে বিচরণ করতেই পারেন। কোন নিবন্ধটি আগে পড়া যায় তার একটা জোর প্রতিযোগিতা চলবে এই বই হাতে পেলে। ধন্যবাদ লেখককে; তিনি আর্কাইভ খুঁড়ে বার করলেন চারুলতা চলচ্চিত্রে পিয়ানো স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ই বাজিয়েছিলেন। এবং ছবি বিশ্বাসের চলচ্চিত্রজীবনকে এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করলেন যেন মনে হচ্ছিল এ এক kaleidoscopic বর্ণনা।

অসম্ভব অন্যরকম ভালোলাগা তৈরি হলো যখন ‘একদিন রাত্রে’ ছবির ব্রাবোর্ণ রোডের শ্যুটিংয়ের ঝক্কিময় ঘটনার ছবি লেখক দিলেন। সাদাকালো ছবি বিশ্বাস লেখকের বর্ণনায়

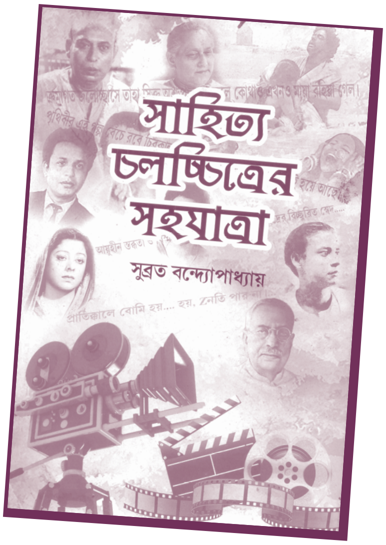

রঙিন। উত্তমকুমার বিষয়ে বাঙ্গালির ভীষণ উন্মাদনা, তাই তাঁর তথ্য কাহিনি ইতিহাস এবং খুঁটিনাটি কম-বেশি চলচ্চিত্রবিলাসী বাঙ্গালিরা রাখে। সুব্রতবাবুর এই নিবন্ধ তাই তাঁর বাকি চলচ্চিত্র নিবন্ধের কাছে অনেকটা পিছিয়ে। কিন্তু চমক রাখলেন লেখক চেতনানন্দের অধ্যায়ে। আমরা তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম এই গুণী মানুষটিকে যিনি হাজার প্রতিবন্ধকতায় ছবি বানিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে যাঁর কাজ সমাদৃত এবং অতি অবশ্যই সমাদৃত সত্যজিৎ রায়ের কাছে এবং চলচ্চিত্রবিশারদদের কাছে। সাহিত্য অংশে কমলকুমার তীব্র কৌতুকে বলতেন— তাঁর বই ১৭ খানা বিক্রি হয়েছে ১৮ জন ফেরত দিয়ে গেছে।’ চেতনানন্দের সিনেমাও খানিক তাই। সুব্রতবাবুর তথ্যখানি পাঠ করতে করতে ওই অনুভূতি হলো। লেখক নিবিষ্ট থেকেছেন স্মৃতিবিস্মৃতি ও আপাত কর্মচর্চিত শিল্প-শিল্পীদের স্মরণে। তাঁর লেখা যত বাঙ্ময় আমার মতো পাঠক যেন ততটাই ‘City Light’-এর মতো নির্বাক ও বিহ্বল।

কমেডিয়ান আলোচনায় মহিলা শিল্পী রাজলক্ষ্মীদেবীর নাম উত্থান এবং তাঁর টুকরো টুকরো ঘটনার উল্লেখ তাঁকে ‘লুকোচুরি’ থেকে সত্যিই ‘Bravo’-তে উন্নীত করতে সাহায্য করলেন লেখকের সংবেদনশীলতা। একপর্দা পেক্ষাগৃহের মায়া অধ্যায়ে মন ভরে গেল কলকাতার এসপ্লানেডকে SEZ বলায়। যাকে Special Economic Zone জানতাম এতদিন, সাহিত্যরসে সুব্রতবাবুর হাতে SEZ হলো Special Entertainment Zone। আর হ্যাঁ, প্রথমটায় একটু অবাক হবেন অনেক পাঠক ‘বিস্মৃত তারকনাথ ও তাঁর স্বর্ণলতা’ নিবন্ধে। বাঙ্গালি তো জানে ‘স্বর্ণলতা’ মানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। লেখক চমকে দিলেন এই খবর দিয়ে, তারকনাথ আসল নাম। নারায়ণ তাঁর ছদ্মনাম! এই বইতেই জানতে পারি, স্বর্ণলতা সম্বন্ধে তারকনাথ (নারায়ণ) সুহৃদ ইন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘আড়ম্বর নাই, নামের ভার নাই’—; সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই তথ্যসমৃদ্ধ আবেগের নানান রঙে রঙিন বইটিও তেমনই। এ বই বাঙ্গালির ইতিহাস, বিস্মৃত সমৃদ্ধির এক পুঙ্খানুপুঙ্খ ডায়েরি। একে বিজ্ঞাপনমুখী অন্য বইয়ের সঙ্গে এক গোত্রে রাখলে পাঠকরাই বঞ্চিত হবেন। রাজশেখর অধ্যায়ে লেখক উল্লেখ করছেন ‘ডিটাচমেন্ট’ শব্দের। রাজশেখর বিপরীতমুখী দ্বৈত সত্তা বর্ণনার হেতু এই শব্দের প্রয়োগ করলেন। একজন সামান্য পাঠক হিসেবে যদি বিচার করি, তবে বলব সুব্রতবাবুরও ডিটাচমেন্ট পরতে পরতে প্রমাণ করে এই বইখানি। পেশায় একজন ব্যাংক আধিকারিক সুব্রতবাবু, যাঁর কিনা মাথা কিলবিল করবে ক্রেডিট- ডেবিট-ব্যালেন্স শীটে। তাঁর এমন শৌখিন সাহিত্য ও ভাবানুরাগ চিন্তাশীলতার ভাবকে সমগ্রতা এবং তথ্যকে পূর্ণতা দেয়। এক কথায় এ বই পাঠকের উদরপূর্তি ও মনতৃপ্তি দুইয়েরেই বিপুল রসদ রাখে।

পুস্তকের নাম : সাহিত্য চলচ্চিত্রের সহযাত্রা। লেখক : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : তুহিনা প্রকাশনী। মূল্য : ২০০ টাকা।

আবর্জনাই গড়ে দিয়েছে ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিহারের সাসারাম নিবাসী বিশ্বেশ কুমার ২০১৪ সালে ব্যাঙ্গালোর থেকে কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে পড়াশোনা সম্পূর্ণ করেন। তারপর ওই বছরই তাঁর খুড়তুতো বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানে বারাণসী গিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যক্ত আবর্জনা বা ঘরোয়া রাবিশের স্তূপের সন্ধান পেলেন। বহুতলগুলির বাসিন্দাদের তিনি অর্থের বিনিময়ে ঘরোয়া আবর্জনা সাফাই করাতে দেখেন। এইসব দেখে শুনে দুই বন্ধুর সঙ্গে মিলে এই ঘরোয়া রাবিশের ব্যবসায় যুক্ত হওয়ার কথা ভাবলেন। ঠিক হলো যে 'সেল কবাড়ী ডট কম' নামে একটি ওয়েবসাইট বানিয়ে প্রতিটি ঘর থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করা চলবে। এই পরিকল্পনা মাফিক ১০ লক্ষ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্য স্থির করা হলো।

লোকজন সাধারণত পুরনো বইপত্র, খাতা, খবরের কাগজ ইত্যাদি জিনিস বেশি দিন রাখে না বা ফেলে দেয়, যেগুলির পুনর্ব্যবহার সম্ভব। এইগুলি বিক্রি করলে ভালো দামও পাওয়া যায়। বিশ্বেশ লোকজনের থেকে আবর্জনা কেনা শুরু করলেন। অন্যান্য আবর্জনা ও জঞ্জাল ক্রেতাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বললেন। শুরুটা ছিল যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের! তার মধ্যে ১০ লক্ষ পরিবারের সঙ্গে সংযোগের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো ছিল একটি অন্যতম কঠিন চ্যালেঞ্জ। তার জন্য প্রয়োজন ছিল বড়ো মাপের নেটওয়ার্ক নির্মাণ এবং সেই নেটওয়ার্ক ধরে রাখা। প্রতিপদে হতোদ্যম করে দেওয়ার মতো লোকজনের অভাব ছিল না। পরিবারেরই কিছু লোক কথা শোনাতো যে লেখাপড়া শিখে শেষে আবর্জনা বিক্রি করবে? কিন্তু হার মানার পাত্র নন বিশ্বেশ। নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন যে ঘরোয়া আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ডোর টু ডোর সার্ভে করেছিলেন। তারপর গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে, সব দিক বিচার-বিবেচনা করে শুরু করলেন কাজ, যার পরিণাম হলো খুবই সদর্থক। তাঁর এই ব্যবসা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেলে আগে যারা তাঁকে নানা কথা শোনাতো তারাই ব্যবসায় অংশীদার পর্যন্ত হতে চাইলো।

কাজ চলছিল ভালো ভাবেই। কিন্তু ২০২০ সালে করোনা ছড়িয়ে পড়ার দরুন তাঁর বার্ষিক ৫ কোটি টাকার ব্যবসা যায় থমকে। এই সময় ওয়্যার হাউজ (গুদামঘর) ও রিয়েল এস্টেটের কারবারের জগতে বিশ্বেশ পা রাখেন। বারাণসী ও বিহারে আজ তাঁর ওয়্যার হাউজের সংখ্যা ২১টি, যেগুলিতে দেশী-বিদেশী কোম্পানিগুলি তাদের পণ্য গুদামজাত করে থাকে। ব্রিটানিয়া, আর্যা, সোহন লাল-মোহন লাল ইত্যাদি বড়ো মাপের কোম্পানিগুলির সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। কৃষকদের কাছে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সঞ্চয়ের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার না থাকার কারণে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ জুড়ে উৎপাদিত ধান ও গমের সঞ্চয় এই গুদামগুলিতেই হয়ে থাকে। এই জন্য খাদ্যশস্য বিক্রির জন্য তাদের মধ্যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। গুদামঘর নির্মাণের সুবিধা হলো যে এর ফলে কিছু দিনের জন্য কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য নষ্ট হয় না, সুরক্ষিত থাকে এবং পরে কৃষকরা ভালো দামে তা বিক্রি করতে পারেন। এই বিষয়টিকে নজরে রেখে রাজ্য সরকার ব্লক স্তরে গুদামঘর নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন স্থানে কৃষকদের থেকে লিজে জমি সংগ্রহ করে চলছে ওয়্যার হাউজ নির্মাণের কাজ। এই গুদামঘরের কারবারে তাঁর বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ ২ কোটি টাকা।

বিএমসি নামক ফ্লাইং অ্যাশের ইটও বানাচ্ছেন বিশ্বেশ, যার বার্ষিক ব্যবসার পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। সাধারণ ইটের তুলনায় এই ইট তৈরির ব্যয় প্রায় অর্ধেক। বিশ্বেশ বললেন যে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে ভূমি খননের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকার কারণে সেখানে ফ্লাইং অ্যাশ নির্মিত ইটের চাহিদা বেশি। ভবিষ্যতে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মতো রাজ্যেও ফ্লাইং অ্যাশের ইটের প্রচলন হবে। এগুলি ছাড়াও, বিশ্বেশ কুমার গ্রুপ হাউজিং বা আবাসন ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত। পড়াশোনা করে চাকরি সন্ধানের মাধ্যমে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে ব্যবসার মাধ্যমে আর্থিক সাফল্য লাভ করা বিশ্বেশ কুমার ভারতের নবীন প্রজন্মের কাছে পরনির্ভরতা ত্যাগ করে আত্মনির্ভরতার বলে বলীয়ান হওয়ার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল উদাহরণস্বরূপ। □

উচ্চাকাঙ্ক্ষী কন্যা

এক অপরূপ সুন্দরী চণ্ডালকন্যা ছিল। বড়ো সরল ছিল তার মন। সবাই তাকে ভালোবাসে। কিন্তু সে ছিল খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সবসময় নিজের বিয়ের স্বপ্ন দেখত। তার ইচ্ছে, সে বিয়ে করবে এমন এক পুরুষকে

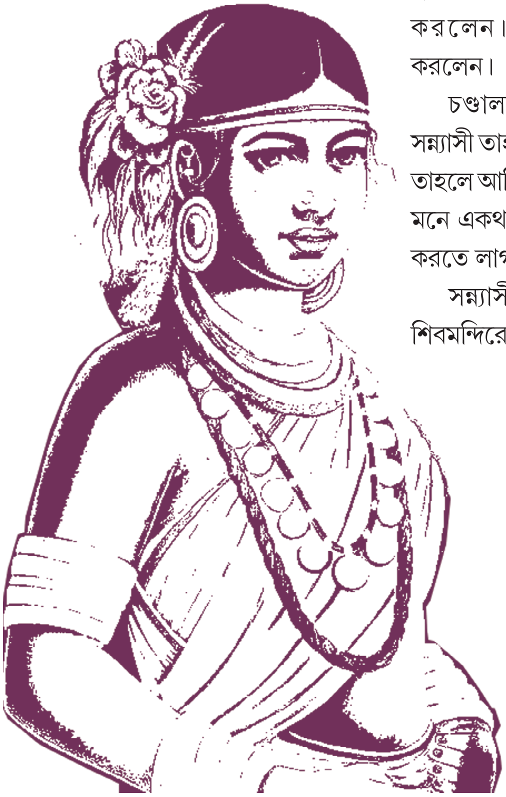

যে কিনা বিদ্যা-বুদ্ধি, ধনসম্পদ সব কিছুতে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।

অনেকদিন ধরে ভেবে সে ঠিক করল দেশের রাজাই সবার উপরে। সবাই তাঁর অনুগত। তাঁর অঙ্গুলিহেলনেই রাজপাট নিয়ন্ত্রিত হয়। দেশের রাজাই হবেন তার স্বপ্নের পুরুষ।

একদিন সেই রাজ্যের রাজা হাতির পিঠে বসে নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। সঙ্গে প্রচুর লোকলশকর। হাতির পিঠে ঝলমলে আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন রাজা। রুপোর চামর দুলিয়ে হাওয়া করছে রাজ-অনুচরেরা।

দূর থেকে দেখে মহা খুশি চণ্ডালকন্যা। সে রাজবাহিনীর পিছু নিল। রাজার হাতি কিছুক্ষণ চলার পরেই সামনে পড়লেন এক সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীকে দেখেই রাজা তাড়াতাড়ি হাতির পিঠ থেকে নেমে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সন্ন্যাসী রাজাকে আশীর্বাদ করলেন।

চণ্ডালকন্যা তখন মনে মনে ভাবল, সন্ন্যাসী তাহলে রাজার থেকে অনেক বড়ো। তাহলে আমি সন্ন্যাসীকেই বিয়ে করবো। মনে মনে একথা ভেবে সে সন্ন্যাসীকে অনুসরণ করতে লাগল।

সন্ন্যাসী কিছুদূর যাবার পর একটি শিবমন্দিরে প্রবেশ করলেন। শিবলিঙ্গের সামনে বসে প্রণাম করলেন। কিছুক্ষণ ধ্যান করে বেরিয়ে গেলেন।

চণ্ডালকন্যার মত ঘুরে গেল। সে ভাবল, শিব তো সন্ন্যাসীর থেকেও বড়ো। তাহলে আর সন্ন্যাসীকে কেন আমি শিবকেই বিয়ে করবো। এই ভেবে সে শিবলিঙ্গের সামনেই বসে রইল।

মন্দিরে বসে সে বিয়ের কথা ভাবছে, এমন সময় কোথা থেকে একটি রাস্তার কুকুর এসে মন্দিরে ঢুকল। এদিক ওদিক দেখে শিবলিঙ্গের সামনে গিয়ে এক পা তুলে তার যা স্বভাব তাই করে চলে গেল।

চণ্ডালকন্যা ভাবল, কুকুর যদি শিবের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে পারে, তাহলে তো কুকুরটা শিবের চেয়ে অনেক বড়ো। শিবকে নয় আমি কুকুটিকেই বিয়ে করবো। এই ভেবে সে কুকুরের পেছনে পেছনে যেতে লাগল। একটু পরে কুকুরটি ছুটতে শুরু করলো, চণ্ডালকন্যাও কুকুরের পিছু পিছু ছুটতে শুরু করলো। খানিকদূর যাবার পর সামনে পড়ল আর একটি চণ্ডালপল্লী। পল্লীর একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল এক চণ্ডাল যুবক। কুকুরটি বোধ হয় তারই পোষা অথবা সে তাকে খেতে দিত। কুকুরটা যুবকের কাছে গিয়ে লেজ নাড়াতে লাগল। তারপর তার পায়ে মুখ ঘষতে লাগল। যুবকটিও কুকুরটির গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

চণ্ডালকন্যা তখন ভাবল, তাহলে তো আমার স্বজাতীয় যুবকটি কুকুরটির চাইতে অনেক বড়ো। আমি তাহলে চণ্ডাল যুবকটিকেই আমার স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবো। একদিন পরেই মহাধুমধামে তাদের বিয়ে হয়ে গেল।

ছোটো বন্ধুরা, মূর্খেরা উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা চলিত হলেও শেষে নিজের উপযুক্ত স্থানই পেয়ে থাকে।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

ঠাকুর রণমত সিংহ

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের জনজাতি যোদ্ধা রণমত সিংহের জন্ম মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার মনখরী গ্রামে। তিনি রেওয়ার মহারাজার অধীনে একজন সর্দার ছিলেন। রাজ্যে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ তিনি মানতে পারেননি। স্থানীয় জনজাতি যোদ্ধাদের তিনি সংগঠিত করে পুলিশ থানা দখল করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি নাগোড়, ভিসসেইন, চিত্রকূট, নৌগোংগ, কেওটি-সহ বহু স্থান থেকে ইংরেজদের উৎখাত করেন। পুরো সাতনা এলাকায় তিনি ইংরেজদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন। রেওয়ার মহারাজা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। একবার সম্মুখ যুদ্ধে তিনি বন্দি হন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যোষণার অপরাধে ১৮৫৯ সালের ১ আগস্ট তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১১

ন– না, **বা**– কি?
(বোতলকে দেখিয়ে)
চষকঃ বা?— গেলাস কি?
ন, চষকঃ ন, কুপী। – না, গেলাস নয়, বোতল।
(চক দেখিয়ে)
লেখনী বা?– কলম কি?।
ন লেখনী ন, সুধাখণ্ডঃ।
(আয়না দেখিয়ে)
উপনেত্রম্ বা?– ন, উপনেত্রম্ ন, দর্পণঃ।
(খাতা দেখিয়ে)
পুস্তকং বা? – ন, পুস্তকম্ ন, অভ্যাসপুস্তিকা।
অভ্যাস করি—
চিত্রম্, বস্ত্রম, স্থালিকা, কঙ্কতম্, কঙ্কনম্, ব্যঞ্জনম্, ব্যজনম্, পত্রম্, পাত্রম্, পুত্রঃ, পুত্রী, ছাত্রঃ, ছাত্রা, ছত্রম্।

ভালো কথা

কাঠবেড়ালি

দু'মাস হলো কোথা থেকে আমাদের বাড়িতে দুটো কাঠবেড়ালি এসেছে। ওরা কোথায় যে থাকে জানি না। মনে হয় আমাদের উঠোনের আমগাছটায় থাকে। দাদুর সঙ্গে ওদের খুব ভাব। দাদু চিনেবাদাম হাতে নিয়ে উঠোনে নামলেই ওরা যেখানেই থাক ছুটে দাদুর কাছে এসে হাত থেকে বাদাম খেয়ে নেয়। বাদাম না দিলে ওরা দাদুর মাথায় ঘাড়ে উঠে খেলতে থাকে। আমি দাদুর কাছে গেলেই ওরা পালিয়ে গাছে উঠে পড়ে। কাকগুলো ওদের দেখে ভয় করে কিন্তু পায়রাগুলোকে কিছু বলে না। উঠোনে পায়রার সঙ্গে ওরা খাবার খুঁটে খায়। দাদু বলেছে, মা কাঠবেড়ালিটার ছানা হবে।

পিয়ালি মাহাত, সপ্তম শ্রেণী, ইটাহার, উঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ন্ত চি স র	(১) স্তা ন্ত ভা ক্রা চি রা
(২) চি বু র জ	(২) চি চি কা ল র ৎ

২২ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর	**২২ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর**
(১) রামলালা (২) কারাদণ্ড/রাজদণ্ড	(১) ঠাকুরদেবতা (২) তিমিরবিনাশী

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা- ৪৯। (২) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা (৩) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, ইংলিশ বাজার, মালদা। (৪) দেবরূপা কর্মকার, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

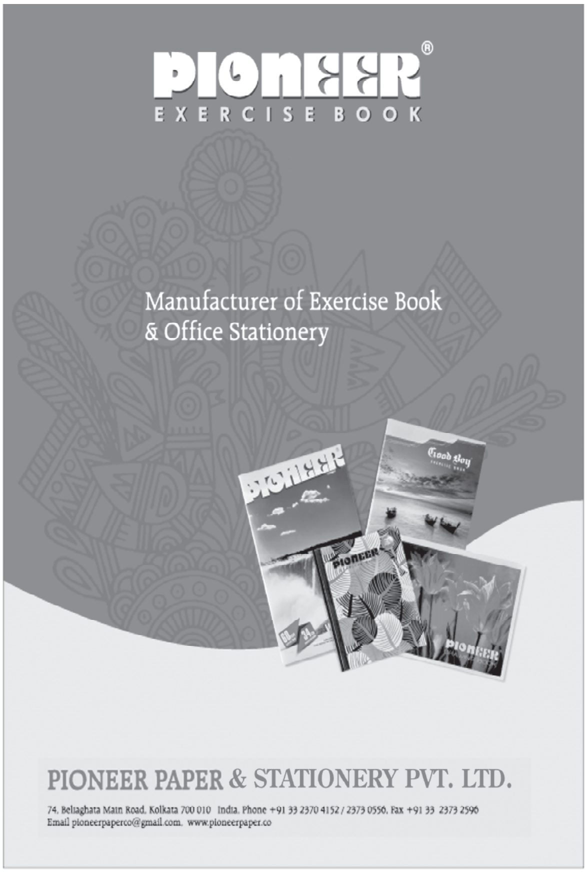

With Best Compliments from -

A

Well wisher

হারিয়ে যাওয়া ভাষা-আন্দোলন

ড. বাপ্পাদিত্য মাইতি

১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। পরের বছর নির্ধারিত ওইদিনে পৃথিবীর ১৮৮টি দেশ বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস পালন করে। মায়ের ভাষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের এই ঘোষণার মধ্যে রয়েছে একটি জাতির মরণপণ সংগ্রামের ইতিহাস— ভাষার ও স্বাভিমানের। ক্ষেত্র পূর্ব পাকিস্তান। ফ্ল্যাশব্যাকে একটু অতীতচারী হওয়া যাক।

১৯৪৭-এর ১৯ মে মুসলিম লিগ নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান যখন ঘোষণা করেছিলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তখন বাঙ্গালি মুসলমান সমাজ খুব একটা প্রতিবাদী হয়নি। কারণ মুসলিম লিগের লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান সৃষ্টির যে দাবি উঠেছিল তাতে এ আশাই ব্যক্ত হয়েছিল, পাকিস্তান কায়েম হলে মুসলমানদের সাহিত্যচর্চার সুবিধা হবে। কিন্তু খুব দ্রুত বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজি মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমেদ, মহম্মদ এনামুল হক প্রবন্ধ লিখে বক্তৃতা দিয়ে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান।

পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয় ১৯৪৮-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি করাচিতে। এ অধিবেশনের পূর্বে পাকিস্তানের কংগ্রেস দলের সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনে। প্রস্তাবটি উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তনের শাসকরা খারিজ করলেও মাতৃভাষা বাংলার স্বপক্ষে ধীরেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তবুদ্ধির এই মহান মানুষটিকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দুভাষী শাসকেরা প্রচার করলেন বাংলা বর্ণমালা হিন্দু বর্ণমালা দেবনাগরী থেকে জাত বলে তা কাফের স্থানীয়। অতএব পরিত্যজ্য। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের বেশকিছু লেখক বুদ্ধিজীবীকে নিজেদের মতভুক্ত করলেন। প্রথম পাক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান নিহত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি ১৯৫২-র জানুয়ারিতে ঢাকায় এসে পল্টনের ময়দানে জিন্নার কথাকে দৃঢ়স্বরে সমর্থন করে বলেন যে, একমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। প্রতিবাদী হলো বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তান। ৩০ জানুয়ারি প্রতীক ধর্মঘটের ডাক দেয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় ভাষা কমিটি'। তীব্র হলো সংঘাত। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে খান সেনাদের গুলিতে নিহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত, মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিকউদ্দিন, কৃষক আব্দুল জব্বর, ব্যাংককর্মী আবদুস সালাম। অন্তত আরো দুজন অজ্ঞাতনামা সেদিন শহিদ হয়েছিলেন। কবি শামসুর রহমান বিক্ষত হৃদয়ে লিখলেন— 'উনিশ শো বাহান্নর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি/ সগৌরবে বুকে নিয়ে আছ মহীয়সী।'

ভাষার জন্য এই আত্মবলীদান নিঃসন্দেহে গর্বের এবং বহুচর্চিত। আন্তর্জাতিক স্তরে অভিনন্দিত। কিন্তু এর পরেই একটি প্রশ্ন থেকে যায়, বাংলা ভাষার স্বাভিমান রক্ষার জন্য শুধুমাত্র সালাম,বরকতদের নাম উচ্চারিত হয় কেন। কেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো অসমসাহসী, নির্লোভ, নৃশংস ভাবে সপুত্র খুন হওয়া মানুষটি অনেক কম উচ্চারিত হন?

বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের চেয়ে কোনো কম ছিল না ১৯৬১ সালে অসমের বরাক উপত্যকায় ভাষা আন্দোলন। ১৯৬০-এর ২২ এপ্রিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস অসমীয়াকে একমাত্র রাজ্য ভাষার স্বীকৃতি হিসেবে প্রস্তাব নেয় এবং ২২ অক্টোবর প্রবল প্রতিবাদের মধ্যেও বিধানসভায় তা 'রাজ্যিক ভাষা বিল' আইনে রূপান্তরিত হয়। বরাক নদীর জলে পুষ্ট কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি জেলা নিয়ে গঠিত বরাক উপত্যকায় তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়। আন্দোলন অহিংস থাকলেও ১৯৬১-র ১৮ মে অসমের কংগ্রেস সরকার প্রবল অত্যাচার শুরু করে। ১৯ মে বরাক উপত্যকায় অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সবকিছু অচল হয়ে যায়। বরাকের প্রধান শহর শিলচরে আন্দোলনের জন্য ট্রেন বন্ধ থাকে। বেলা ২টোয় ঘটে সেই ভয়াবহ ঘটনা। কাটিগর থানা থেকে হাতকড়া পরানো ভাষা আন্দোলনকারীদের যে ট্রাকে আনা হচ্ছিল তা লেভেল ক্রসিঙে আটকে পড়ে। ভাষা আন্দোলনকারীরা সম মনোভাবের শিকলবন্দি আন্দোলনকারীদের মুক্ত করার জন্য যখন সক্রিয় হন তখন হঠাৎ সেই ট্রেনে আগুন লেগে যায়। ভাষা সত্যাগ্রহীদের চেষ্টায় যখন তা নেভানোর চেষ্টা করা হয় তখন পুলিশ হিংস্র উন্মত্ততায় গুলিবর্ষণ করলে নিহত হন এগারো জন। আহত সংখ্যাহীন। ভাষা আন্দোলনের জন্য প্রাণদান করেন ১১ জন। ১. কমলা ভট্টাচার্য, ২. সুকোমল পুরকায়স্থ, ৩. কুমুদ দাস, ৪. বীরেন্দ্র সূত্রধর, ৫. এক রেলওয়ে কর্মী, ৬. সুনীল সরকার, ৭. সত্যেন্দ্র দেব, ৮. হিতেশ বিশ্বাস, ৯. চণ্ডীচরণ সূত্রধর, ১০ তরুণী দেবনাথ, ১১. শচীন্দ্র পাল।

ভাষা আন্দোলনকারীরা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন কোমর থেকে বুকের মধ্যে এবং সামনের দিক থেকে। কেউ পালিয়ে যায়নি। যেতে চানওনি। কিন্তু আ-মরি বাংলা ভাষার জন্য এই আন্দোলন, বলিদান ব্যর্থ হয়নি। বরাক উপত্যকায় বাংলা তার মর্যাদাময় স্বীকৃতি আদায় করেছে।

বাংলা ভাষার জন্য সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ও তার সামান্য কিছু পরে অসমে সংগঠিত হয়েছিল তীব্র আন্দোলন। শাসকের গুলিবর্ষণে মৃতের সংখ্যাও একদিনে সর্বোচ্চ ছিল বরাক উপত্যকায়। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাভাষীরা ছিলেন বিপুল সংখ্যক। সীমাহীন জনতার সমর্থন ছিল তাঁদের সঙ্গে। অন্যদিকে বরাক উপত্যকায় ছিল অনেক কম সংখ্যায় বাঙ্গালি। সারা বিশ্বের বাংলা ভাষীদের মাত্র দেড় শতাংশ বাস করতেন সেখানে। এই বিন্দু পরিমাণ উপস্থিতি নিয়েও বরাক উপত্যকার ভাষা আান্দোলনকারীরা যথেষ্ট আলোচিত হন না। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতো ওই এগারো জনও অনুষঙ্গ হিসেবেই উঠে আসেন। ভাষা আন্দোলনের রাজাধিরাজের খ্যাতি আসে না তাঁদের। জব্বর, বরকত, সালামরা যত আলোচিত, দ্যুতির বন্যায় প্লাবিত, তাঁর কণামাত্র আলোর টুকরোও এদের কপালে জোটে না! □

ভারতে গ্রিক আক্রমণ ও ভারতীয় যোদ্ধা

অমলেশ মিশ্র

ভারত ভূখণ্ডে সেকন্দার বা আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণই প্রথম বৈদেশিক আক্রমণ। এই ঘটনা খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দের অর্থাৎ আজ থেকে ২৬০০ বছর আগের ঘটনা। তার প্রায় এক হাজার পরে ভারতে ইসলামি আক্রমণ হয়েছিল। সেই সময় ভারতে গ্রিক আক্রমণের কোনো নাম-নিশানা ছিল না। হতে পারে যে, এই ইসলামি আক্রমণের দু' হাজার বছর পরে অর্থাৎ ২৭০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারতে কোনো ইসলামি আক্রমণের প্রভাব থাকবে না।

ভারতে গ্রিক আক্রমণের প্রায় আটশো বা ন'শো বছর পরে ইসলামের প্রবর্তন হয়েছিল। তখন ইউরোপে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি জাতির জন্ম হয়নি। রোমান সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একমাত্র গ্রিসই সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। গ্রিস দেশে ছিল ছোটো ছোটো নগর-রাজ্য যারা স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করত। তাদের মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টাই খুব নামকরা নগর রাজ্য ছিল।

এশিয়া মহাদেশের পরাক্রমী রাজ্য পারস্য এই ক্ষুদ্র নগর রাজ্যগুলিকে বিধ্বস্ত করেছিল। গ্রিকরা উপলব্ধি করেছিল যে, ছোটো ছোটো গ্রিক রাজ্যগুলি এক এক পারস্য বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠবে না। কিন্তু ছোটো ছোটো নগর রাজ্যগুলি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি দেশ গঠন করে তবে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করা যাবে এবং পারস্য আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে সক্ষম হবে।

ম্যাসিডন নামে একটি গ্রিক রাজ্যটির শাসক ফিলিপ এই উদ্দেশ্য নিয়েছিলেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তার পুত্র সেকেন্দার ম্যাসিডোনিয়ার কর্তৃত্ব পেলেন। কর্তৃত্ব পেয়েই শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করেন এবং খ্রিস্টপূর্ব ৫৩১ অব্দে পারস্যরাজ দরায়ুসকে পরাজিত করে পারস্য দখল করে নিজেকে পারস্য-সম্রাট ঘোষণা করলেন। এই ভাবে তিনি একাধারে গ্রিস ও পারস্যের সম্রাট হলেন। রাজা ফিলিপের পুত্র সেকেন্দার আলেকজান্ডার নামেই ভারতে পরিচিত। আলেকজান্ডার নিজেকে গ্রিক দেবতা পরাক্রমী জিউসের পুত্র বলে প্রচার করলেন।

তাঁর মধ্যে অহমিকা ও রাজ্য জয়ের প্রবল বাসনা জাগরিত হলো। বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন— ১ লক্ষ ২০ হাজার পদাতিক এবং ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য।

গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতের সমকালীন না হলেও খ্রিস্টমত প্রবর্তিত হওয়ার অনেক আগেকার। সুমেরু, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি দেশে যখন সভ্যতার বিকাশ হচ্ছিল তখন গ্রিসদেশের পার্শ্ববর্তী ভূমধ্যসাগরে ক্রিট্ নামে দ্বীপটিতে একটি উচ্চমানের সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। ওখানকার রাজপ্রাসাদ (রাজা-মিল্স্) ঘরবাড়ি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে ক্রিট সভ্যতা ধ্বংস হয়।

খ্রিস্ট জন্মের প্রায় ১৬০০ বছর আগে গ্রিসদেশে মাইসিনীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মহাকবি হোমার প্রণীত ইলিয়াড কাব্যে মাইসিনিয়ার রাজা অ্যাগামেমননের উল্লেখ আছে। এই রাজ্যটি ছিল গ্রিস দেশের দক্ষিণাঞ্চলে। উত্তর গ্রিসের ডোরিয়ালদের আক্রমণে দক্ষিণ গ্রিসের এই সভ্যতা নষ্ট হয়।

মধ্যগ্রিসের অ্যাটিকাতে আইয়োনীয় জাতির লোকেরা এশিয়া মহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। ক্রমে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল গ্রিক সভ্যতার আওতায় চলে আসে। এথেন্স নগরী ছিল অ্যাটিকাতে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্য সব বিষয়ে এথেন্স যথেষ্ট উন্নত ছিল।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট দরায়ুস গ্রিস আক্রমণ করেন। ম্যারাথনের যুদ্ধে (৪৯০ খ্রিস্টপূর্ব) এথেন্স গ্রিকবাহিনী পারসিক বাহিনীকে প্রতিহত করে। কিন্তু ১০ বছর পরেই দরায়ুস পুত্র জেরেক্সেস গ্রিস আক্রমণ করেন। থার্মোপালির যুদ্ধে গ্রিকরা পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে স্পার্টার বাহিনী প্রবল বীবত্ব দেখিয়েছিল। পরে হিপোস্টেক্লিসের নেতৃত্বে সালামিসের নৌযুদ্ধে পারসিকরা পরাজিত হয়।

কবি নবীন চন্দ্র সেন তাঁর 'আশা' কবিতায় লিখেছেন :

'ম্যারাথন, থার্মোপলি
হয়েছে শ্মশান স্থলি
গিরিস আঁধারে আজ
পোহাইছে রাতি।
এই তো কালের গতি

এইতো নিয়তি।'

এই সময় পেরিক্লিসের রাজত্বকালে (৪৯৯-৪৩৯ খ্রিস্টপূর্ব) গ্রিসের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। স্পার্টা ও এথেন্স পরস্পর যুদ্ধ করেছিল। আবার স্পার্টাকে হারিয়ে থিবস্ শক্তিশালী হয়েছিল। কিন্তু ৫০ বছরের মধ্যেই থিবসের পতন এবং ম্যাসিডনের উত্থান। আলেকজান্ডার এই ম্যাসিডনেরই রাজা ফিলপের পুত্র।

মনে রাখতে হবে যে আমরা বহু সময়ে তিনজন গ্রিক দার্শনিকের নাম উল্লেখ করি— সক্রেটিস (৪৬৯ খ্রিস্টপূর্ব), প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রিস্টপূর্ব) এবং অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্ব)। তাঁরা এই যুগেরই। জানা যায় যে সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন প্লেটো এবং প্লেটোর শিষ্য অ্যারিসটটল। আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণের পর ফেরার পথে মারা যান (৩২১ খ্রিস্টপূর্ব)।

গ্রিসের পতনের পর রোমানদের উত্থান হয়েছিল। রাজা সিজারকে হত্যা করেন তাঁর সুহৃদ— ব্রুটাস। ব্রুটাসের অভিযোগ ছিল যে সিজার ক্রমশ স্বৈরাচারী হয়ে উঠায় তিনি তাকে হত্যা করেন। কবি শেক্সপিয়ারের ভাষায় ব্রুটাস বলেছিলেন— Not that I loved caeser less sect I loved Rome more অর্থাৎ সিজারকে আমি কম ভালোবাসতাম না কিন্তু তার থেকেও আমি রোমকে বেশি ভালোবাসতাম। (শেস্কপিয়ারের নাটক জুলিয়াস সিজার)।

সেইকালে ভারতবর্ষের সীমা ও বসতি পারস্যের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিন্দুকুশ পর্বতকে গ্রিক ভাষায় বলা হতো পেরোনিসাস। আফগানিস্তানের প্রাচীন ভারতীয় মাম ছিল— অহিগণস্থান, আরও পরে গান্ধার। কাবুল নদীর নাম ছিল কুভা নদী। হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত এলাকায় ভারতের ছোটো-বড়ো রাজ্য ছিল। সেগুলি বৈদিক বিধি অনুসারে পরিচালিত হতো। রাজ্যগুলি গণরাজ্য বা গণ নামে পরিচিত ছিল। একটি বড়ো রাজতান্ত্রিক রাজ্য ছিল— পৌরব বা গ্রিস ভাষায় পেয়রাস।

হিন্দুকুশ পার হয়ে আলেকজান্ডার প্রথম ভারতে প্রবেশ করলেন তখন তক্ষশীলার রাজা অম্ভি বা অম্ভুজ তার বশ্যতা স্বীকার করলেন। তক্ষশীলা ছিল বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। ছোটো ছোটো গণরাজ্যগুলির কোনটি আলেকজান্ডারের বিরাট বাহিনীর সামনে কোনো প্রবল প্রতিরোধ তৈরি করতে পারেনি। প্রথম প্রবল প্রতিরোধের মুখে আলেকজন্ডার পড়লেন পৌরব রাজ্যের রাজা পুরুর সামনে। কিন্তু পৌরবরাজ্যের বাহিনীতে মূলত হাতি, রথ ও পদাতিক সৈন্য। অশ্বারোহী বাহিনী ছিল না। আলেকজান্ডারের বাহিনীতে ১৫ হাজার অশ্বারোহী ও সর্বাধিক পদাতিক সৈন্য। বিস্ততা নদীর উভয় তীরে ওই সৈন্যসমাবেশ হয়। হঠাৎ বর্ষণে ঝিলম নদীতে বন্যা। ফলে গজ ও রথ বাহিনী কাদায় অগ্রসরে ব্যর্থ হয়। আলেকজান্ডারের অশ্ববাহিনী বিশেষ অসুবিধায় পড়ল না। পুরুর পৌরব রাজ্য আলেকজান্ডার দখল করলেন।

পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ আলেকজান্ডার। ভবিষ্যতে পুরুর সাহায্যলাভের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে পুরুকে তার রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। যতগুলি ছোটো ছোটো রাজ্য তিনি জয় করেছিলেন সেগুলিরও শাসনভার পুরুর হাতে দিয়ে পুরুর রাজ্যসীমা বাড়িয়ে দিলেন।

গ্রিক লেখকরা ভারতীয় গণরাজ্যগুলির সঙ্গে গ্রিকবাহিনীর অনেকগুলি লড়াইয়ের বর্ণনা দিয়েছেন। সবগুলি উল্লেখ সম্ভব নয়। তবু ভারতীয় যোদ্ধারা আলেকজান্ডারকে যে বাধা দিয়েছিলেন তার ফলে তাকে বার বার নতুন সৈন্য আনতে হয়েছিল। ছোটো ছোটো রাজ্যগুলি পরাজিত হলেও যে বিক্রম প্রকাশ করেছিল তার প্রভাব গ্রিকবাহিনীর উপর পড়েছিল এবং তারা যুদ্ধ ত্যাগ করে দেশে ফিরে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছিল।

আলেকজান্ডার সম্পর্কে আমাদের ইতিহাস পুস্তক প্রণেতারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা লিখেছেন। তাদের কথায় আলেকজান্ডার 'ভিনি ভিডি ভিসি' অর্থাৎ এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। তাই যদি সত্য সত্যই হতো তাহলে আলেকজান্ডারের সেনাপতিরা ও সৈন্যবাহিনী দেশে ফেরার জন্য ধর্মঘট গোছের কিছু নিশ্চয় করত না। তাঁর সেনাবাহিনী ভারতীয় সৈন্যদের মুখোমুখি হতে চাইছিল না। আলেকজান্ডার সেনাপতি-সহ সৈন্যবাহিনীকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দিন তিনেক নিজেকে সকলের সংশ্রব ত্যাগ করে নিজের শিবিরেই অন্তরীণ থাকলেন। তাতেও তিনি নিজবাহিনীর মত পরিবর্তন করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি সৈন্যবাহিনীকে (অবশিষ্ট) নিয়ে দেশে ফিরতে রাজি হলেন তবে যে পথে এসেছেন সে পথে নয়, নতুন পথে।

স্কুল, কলেজের পাঠ্যপুস্তকে যা লেখা হয়েছে তা ভারতীয়দের হীনম্মন্য করে তোলে। ভারতীয় যোদ্ধাদের বীরত্বের প্রসঙ্গ তাঁরা উল্লেখ করেননি। কেবল পুরুর বিষয়ে একটি গল্প আছে মাত্র। ফলে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের দেশের বীরদের কথা জানতে পারে না। ইংরেজদের অভিপ্রায়ও তাই ছিল— তারা চেয়েছিল ভারতীয় ছাত্ররা জানুক যে তারা বরাবরই পরাধীন জাতি। আর্যরা বিদেশ থেকে এসেছিল, গ্রিকরা বিদেশ থেকে এসেছিল, শক, হুন, পাঠান, মোগল সকলেই বিদেশ থেকে এসে ভারতীয়দের উপর রাজত্ব করেছে। এদেশে বীর নাই বীরত্ব নাই, পরাক্রম নাই, পরাক্রমী নাই, এদেশের মানুষদের স্বাভিমান নাই। দেশপ্রেম নাই। তাই অন্যান্য বিদেশিদের মতো বিদেশি ইংরেজও তাদের

শাসন করছে। তাই ভারতীয়দের ইংরেজ শাসন মেনে নেওয়াই ভবিতব্য। তাদের গায়ের রং শুধু ভারতীয় হবে বাকি সব চিন্তাভাবনা, মানসিকতা, পোশাকপরিচ্ছদ, পান ভোজন সবই ইংরেজদের মতো হবে।

তারা সফল হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে ইংরেজ প্রথম ভারতীয়দের সংগঠিত বীরত্বের রূপ দেখেছিল। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠন করে ইংরেজ-প্রেমীদের হাতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয়রা অধিকাংশই সংগঠনগত ভাবে কংগ্রেস হয়েও ইংরেজদের বিরুদ্ধে অহিংস আন্দোলনে বার বার সহিংস হতেন দেশপ্রেম ও দেশাভিমানের কারণে। আর ভারতের বীর বিপ্লবীরা ছিলেন কংগ্রেসের বাইরে, যদিও কংগ্রেসি নেতা তাদের বিষয়ে কটু কথাই বলতেন।

আলেকজান্ডার ছিলেন বিদ্যানুরাগী। তাঁর দূতেরা বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করত। তারা যোগী-ঋষি, পরিব্রাজক, তত্ত্বচিন্তক, মনীষী ও তপস্বীদের আলেকজান্ডারের আগ্রহক্রমে সেইসব ভারতীয়দের কাউকে কাউকে তাঁর সামনে উপস্থিত করত। যোগী, ঋষি, তপস্বীদের গ্রিক ভাষায় বলা হয়— জিমনোসাফিস্ট।

দুজনের কথা বলা দরকার। একবার একযোগীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে তাঁর দিগ্বিজয় সফল হবে কি না। তার উত্তরে সেই যোগী একটি শুকনো কুঁকড়ানো চামড়াকে চৌরস করতে করতে দেখালেন যে, একদিকে চৌরস করেন তো আর একদিকে পাকিয়ে যায়। যোগী বললেন, রাজ্য জয় করে যতই এগাতে থাকবেন, পিছনের রাজ্যগুলি আবার স্বাধীন হয়ে যাবে।

জ্ঞানকেন্দ্র তক্ষশীলার এক ব্রাহ্মণ দণ্ডামিসকে আলেকজান্ডার ডেকে পাঠান। দূত বলে যে দণ্ডামিস যদি আলেকজান্ডারের সঙ্গে দেখা না করেন তবে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হবে। দণ্ডামিস হেসে বলেছিলেন, আলেকজান্ডার এখনও ব্যাস নদীর অপর পাশ দেখেননি। ওপারের প্রতাপশালী রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যদি বেঁচে থাকেন তখনই আমি তাকে দিগ্বিজয়ী স্বীকার করব। আমার কাছে ওঁর কোনো মূল্য নেই।

প্লুটার্ক আর একটি কাহিনি বলেছেন। আলেকজান্ডার বুঝেছিলেন যে সংসারত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের খুব প্রভাব আছে এদেশের মানুষের উপর। তাঁরা আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিক্ষোভ তৈরি করছেন। তিনি এই রকম কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও যোগীর শিরশ্ছেদ করলেন। তাদের হত্যা করার আগে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেন তারা গ্রিকদের বিরুদ্ধে কথা বলেন, উত্তরে তাঁর বলেছিলেন— বাঁচাতে হলে সম্মানের সঙ্গে বাঁচব আর মরতে হলে সম্মান রক্ষার জন্যই মরব।

সেই সময়ের গণ্যরাজ্যগুলির মধ্যে কঠ ও সৌভূতি উল্লেখযোগ্য। আর একটি রাজ্য—সৌধেয়। ব্যাস নদীর দক্ষিণে এই রাজ্যকে সকলে সমীহ করত। এখানে ১৮-২১ বয়স্ক সকলকে সামরিক শিক্ষা নিতেই হতো। গ্রিকবাহিনী ব্যাসনদীর তীরে এসে শুনল, সৌধেয় গণরাজ্য তাদের স্বাধীনতা রক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আরও জানতে পারল যে অনুরূপ পরাক্রমশালী রাজ্যগুলিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। গ্রিকবাহিনী ইতিমধ্যেই ভারতীয় বীর যোদ্ধাদের পরিচয় পেয়েছে। সংখ্যায় বিরাট হওয়ার ছোটো ছোটে রাজ্যগুলিকে তারা পরাজিত করেছে, কিন্তু মূল্য দিতে হয়েছে অনেক। বার বার নতুন বাহিনী আনতে হয়েছে। তারা ব্যাস নদী অতিক্রম করে আর অগ্রসর হতে রাজি হলো না। আলেকজান্ডারের পরিকল্পনা ছিল মগধ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া। ফলে গ্রিকবাহিনীর সেনাপতি ও সৈন্যদের নিয়ে তিনি সভা করলেন, মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করলেন।

ঐতিহাসিক স্মিথ লিখেছেন যে আলেকজান্ডার তাঁর বাহিনীর বহু বিজয়ের উল্লেখ করলেন। এশিয়ার সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ জয় করে তাদের দেওয়ার কথা বললেন। কিন্তু গ্রিকবাহিনী কোনো উৎসাহ দেখাল না। 'The Greek Army refused to more An such formaral against the nafions whese very name stuck his seldicrs with terror'। আলেকজান্ডার ক্রোধ প্রকাশ করলেন না বটে তবে নিজের শিবিরে তিনদিন অন্তরীণ থাকলেন, কোনো কাজ হলো না। সেনাপতিদের সঙ্গে সভা করে তিনি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু যে পথে এসেছেন সেপথে ফিরবেন না। কাজেই স্থলপথ ত্যাগ করে সিন্ধু নদীর তীর ধরে সমুদ্র পর্যন্ত গিয়ে, সমুদ্র পথে পারস্য যাবেন। নদী ও সমুদ্র পথে যাওয়ার জন্য কয়েকশত জলযান তৈরি হলো।

ভারতীয় ছোটো ছোটো রাজ্যগুলি কখনও সম্মিলিত ভাবে গ্রিক সৈন্যদের মুখোমুখি হয়নি। ফলে তারা গ্রিকবাহিনীকে দুর্বল ও ক্লান্ত করতে পারলেও পরাস্ত করতে পারেনি। গ্রিক সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশি ছিল। ভারতীয় এই ছোটো রাজ্যগুলির প্রধান শক্তি ছিল স্বদেশাভিমান। মালব ও শূদ্রক রাজ্য দুটি ছিল সমৃদ্ধিশালী, পরাক্রমী ও স্বাভাভিমানী। গ্রিকবাহিনীর আক্রমণ বিষয়ে সচেতন হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বিরোধ ভুলে একত্রিত হলো এবং একই নেতৃত্বের অধীনে আনল। উভয় গণরাজ্যের এক হাজার কুমারীর সঙ্গে অন্য গণরাজ্যের এক হাজার যুবকের বিবাহ দেওয়া হলো।

এই সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় গ্রিকরা একটি নগর অবরোধ করে ছিল কিন্তু দখল করতে পারছিল না। সিঁড়ি দিয়ে নগর প্রাচীর অতিক্রম করে নগরে প্রবেশ করার ব্যবস্থা হলো। আলেকডান্ডার নিজে আগে উঠলেন, দেখাদেখি সৈন্যরাও। আলেকজান্ডার তিরবিদ্ধ হলেন। কিছুকাল বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বুঝলেন যে যৌথ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ সম্ভব না হতে পারে। তাই সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁর Early History of India বইতে লিখেছেন— সেই সব খণ্ডজাতি জাতীয় অসম্মানের বিনিময়ে বেঁচে থাকতে পারতেন। কিন্তু তা না করে মৃত্যুবরণ করেন।

মাসাগা, অগ্রসেনী প্রভৃতি কিছু খণ্ডজাতি যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে নিজেদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে নিজেরা সপরিবারে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সিন্ধু প্রদেশের এক শহরকে মুসলমান হায়দরাবাদ বলে— প্রাচীন নাম পট্টন পন্থ। সেখানকার অধিবাসীরা বুঝলেন— গ্রিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জয় সম্ভব নয়। কিন্তু আত্মসমর্পণ করা যায় না। তারা মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে গেলেন। এরকম স্বদেশাভিমান, আত্মমর্যাদাবোধ ও বীরত্বের কাহিনি অনেক আছে। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে তার সামান্যতম উল্লেখও নেই। আলেকজান্ডার চলে যাওয়ার পর বহু রাজ্য আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।

আলেকজাণ্ডার হিন্দুকুশ ও গান্ধার থেকে ব্যাস নদী পর্যন্ত পঞ্চনদের অর্ধাংশ নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাজা অম্ভীকে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রাজা পুরুকে করলেন পঞ্চনদের শাসক। দেখাশোনার জন্য ফিলিপ ও নিকোলারকে নিযুক্ত করেছিলেন।

আলেকজান্ডারের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অশ্বিনা নামে এক গণরাজ্যের অধিবাসীরা ওই দুজনের শিরশ্ছেদ করে। আলেকজান্ডার যেসব দেশ জয় করেছিলেন সবগুলিতেই তাঁর স্মারক আছে কিন্তু ভারতে তাঁর কোনো স্মারক নেই। □

শুধু উত্তরাখণ্ডে নয়, সারাদেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চাই

মণীন্দ্রনাথ সাহা

জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রধান দাবি ছিল— এক দেশে দুই প্রধান, দুই নিশান, দুই বিধান চলবে না। অর্থাৎ এক দেশে সবার জন্য এক প্রধান, এক নিশান এবং এক আইন বলবৎ করতে হবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আলাদা আইন চলতে পারে না। এই দাবি নিয়ে তিনি কাশ্মীরে প্রবেশ করলে শেখ আব্দুল্লার পুলিশ তাঁকে বন্দি করে এবং সেখানেই ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন বন্দি অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু অনেকেই মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর ইশারায় শেখ আব্দুল্লা শ্যামাপ্রসাদকে হত্যা করেছেন।

ভারত সরকার শ্যামাপ্রসাদের দাবি মতো যা এখনও করতে পারেনি, ভারতের কোনো রাজ্য যা চিন্তা করেনি সেই কঠিন কাজটিই করে দেখালেন দেবভূমি উত্তরাখণ্ড রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিংহ ধামি। নতুন ইতিহাস রচিত হলো সবার জন্য এক আইন। উত্তরাখণ্ডে যত ধর্মের মানুষ বসবাস করেন সবার জন্য এক আইন লাগু হয়ে গেল। দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে নজির সৃষ্টি করে উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউনিয়ন সিভিল কোড) বিল। এবার বিলটিতে রাজ্যপাল স্বাক্ষর করলেই সেটা আইনে পরিণত হবে।

বিশেষ অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বিধানসভায় বিলটি পেশ করেন। বিল পেশের সঙ্গে সঙ্গেই অধিবেশন কক্ষে থাকা বিজেপি বিধায়করা বন্দেমাতরম ও জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে থাকেন। অধিবেশনের তৃতীয় দিনে অনায়াসে তা পাশ হয়ে যায়। এই বিলে সুপারিশ করা হয়েছে, যদি কোনো যুগল একত্রে বসবাস বা 'লিভ-ইন' করতে চায় তাহলে তাদের অবশ্যই পুলিশ বা জেলা আধিকারিকদের অনুমতি নিতে হবে। আর যদি তাদের বয়স ২১ বছরের নীচে হয়, তবে তাদের বাবা-মায়ের সম্মতির প্রয়োজন পড়বে। অনুমতি না নিলে সর্বোচ্চ ৬ মাসের জেল, জরিমানা ২৫ হাজার টাকা। ধর্মনির্বিশেষে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ ও ছেলেদের ২১ বছর। রেজেস্ট্রি বাধ্যতামূলক। দত্তক সন্তান নেওয়ার নিয়ম আরও সহজ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। দত্তক সন্তানরাও বাবা-মায়ের সম্পত্তির অধিকারী। বাবা-মায়ের সম্পত্তির ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের সমান অধিকার থাকবে। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

আমাদের দেশে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য একই ফৌজদারি আইন বলবত রয়েছে। কিন্তু দেওয়ানি বিধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন আইন মেনে চলার বিধান চালু রয়েছে। যেমন--- হিন্দু কোড আইন, মুসলমানদের শরিয়ত আইন প্রভৃতি পৃথক ভাবে দেশে বলবত রয়েছে। এগুলি মূলত মহিলাদের অধিকার, ব্যক্তিগত আইন, বিবাহ বিচ্ছেদ, বহুবিবাহ, সম্পত্তির অধিকার, ভরণপোষণ, উত্তরাধিকার ও দত্তক গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক আইন। ইউসিসি আসলে একটি সাধারণ আইন, যা সব সম্প্রদায়ের জন্য প্রযোজ্য হবে।

ভারতজুড়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা বিজেপি দলের দীর্ঘদিনের লক্ষ্য। বিজেপি তাদের নির্বাচনী সংকল্পপত্রেও বিষয়টি বার বার তুলে ধরেছে। এছাড়া ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এক দেশ, এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধানের দাবিকে সামনে রেখে বিজেপি কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করে সেখানকার আলাদা জাতীয় পতাকা এবং কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর পদ খারিজ করে দেশের রাষ্ট্রপতির অধীনে এবং ভারতের জাতীয় পতাকার অধীনে কাশ্মীরকে নিয়ে এসেছে। বাকি রয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা সবার জন্য একই আইন। তার মধ্যে দেশের দেবভূমি উত্তরাখণ্ড সরকার এই আইন প্রণয়ন করে দেশকে পথ দেখালো। ইতিমধ্যে রাজস্থান সরকারও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রসঙ্গ তুলেছে। আশা করা যায় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সমগ্র দেশ জুড়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করে সবাইকে এক সুতোয় বাঁধবে কেন্দ্র সরকার।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একাধিকবার একাধিক মামলার রায় দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন করতে বলেছে। ১৯৮৫ সালে শাহবানু মামলায় (মহম্মদ আমেদখান বনাম শাহবানু বেগম) সর্বোচ্চ আদালত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সওয়াল করে, কিন্তু তৎকালীন রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োগ না করে ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে ১৯৮৬ সালে মুসলমান মহিলা বিল পাশ করায় সংসদে। এরপর ১৯৯৫ সালে সরলা মুদগল মামলায় সুপ্রিমকোর্ট আবারও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পক্ষে সওয়াল করে। এছাড়াও লিলি টমাস বনাম ভারত সরকার মামলায় এবং আরও কয়েকটি মামলায় রায়দানকালে সর্বোচ্চ আদালত অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে দেশের সুপ্রিমকোর্ট একটা উল্লেখযোগ্য রায়ে উল্লেখ করেছিল— 'শরিয়ত আইনের কোনো লিগ্যাল অথরিটি নেই।' কিন্তু মহামান্য শীর্ষ আদালত শরিয়ত কোর্টকে নিষিদ্ধ ঘোষণাও করেননি।

স্বাধীনতার পরেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু নিয়ে শুরু হয়েছিল আলোচনা। ১৯৪৮ সালের নভেম্বরে সংবিধান সভায় বিষয়টি নিয়ে বিতর্কও হয়েছিল। অধিকাংশ মুসলমান সদস্য বিধি প্রয়োগের বিরোধিতা করায় খারিজ হয়ে যায় সেই প্রস্তাব। কিন্তু সভায় শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ভারতের অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে। তাই এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরে দেরিতে হলেও উত্তরাখণ্ড সরকার এই আইন লাগু করে সংকীর্ণ রাজনীতির বৃত্তের বাইরে আসতে পেরেছে। এই আইনকে সমর্থন করে এখন সারাদেশে আওয়াজ উঠবে— এক দেশ এক আইন, এক লক্ষ্য যা ভারতীয় সভ্যতার মূলমন্ত্র 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর ফলিত রূপকে সাকার করতে। □

২০৩০ সালের মধ্যে সাত ট্রিলিয়ন অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্যে ভারত

কেন্দ্রীয় বাজেটে পেশের প্রাক্কালে গত ২৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের 'ভারতীয় অর্থনীতি : একটি পর্যালোচনা' শিরোনামে প্রতিবেদনটিতে দাবি করা হয়েছে, আগামী তিন বছরের মধ্যে ভারত ৫ ট্রিলয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে। এবং ২০৩০ সালের মধ্যে আস্তে আস্তে ভারত ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হতে পারে। এদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৭.২ শতাংশ থাকতে পারে বলেও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ওই প্রতিবেদনে। এদিকে বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির হার এই সময়কালে ৩ শতাংশ হবে। এই নিয়ে টানা তিন বছর ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে বলে দাবি করা হয়েছে প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদন ভারত সরকারের 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা' শিরোনামাঙ্কিত প্রতিবেদনের সমতুল।

যদিও সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা' এবার পেশের সুযোগ পায়নি কেন্দ্র। কারণ এবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট হয়নি, ভোটের মুখে ভোট অন অ্যাকাউন্ট বা অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট পেশ হয়েছে মাত্র। ভোটের পর নবনির্বাচিত সরকারের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করারই রীতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মোদী-জমানায় কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের দিনক্ষণ পরিবর্তন করে ফেব্রুয়ারির প্রথম দিনে তা ধার্য করা হয়েছে। এর আগে বহু দশক ধরেই দেশের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হতো ফেব্রুয়ারির শেষ দিনে। তবে ২০১৭ সালে সেই প্রথা ভেঙে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিনে বাজেট পেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। পরবর্তীতে নির্মলা সীতারামন সেই নয়া প্রথা অব্যাহত রাখেন। আর এরই সঙ্গে প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারি পেশ হয় দেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা। এ বছর ভোটের কারণে তা করতে না পারা গেলেও অর্থনীতির পর্যালোচনা করে উল্লেখিত প্রতিবেদনটির মাধ্যমে 'অর্থনৈতিক সমীক্ষা'র সমতুল একটি সমীক্ষার ফলাফল অন্তত প্রকাশ করেছে কেন্দ্র।

উল্লেখিত প্রতিবেদন থেকে এটা স্পষ্ট যে অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে দেশের অর্থনীতি। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক গ্রাফেই সেটা প্রতিভাত হয়েছে। বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের মতে, ২০২৩ সালেও ভারত সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। ভারতের জিডিপি এই বছর ৬.৩ শতাংশ গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী বছরেও বড়ো অর্থনীতির দেশগুলির মধ্যে ভারতের গতি সবচেয়ে বেশি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারতে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি। কেন ভারতে বিনিয়োগ হচ্ছে, সে বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছে ইস্পাত ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী বালাজী কর্পোরেট সংস্থা। সংস্থার তরফে জানানো হয়, ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা লক্ষ্যণীয়। এর বেশ কিছু কারণও রয়েছে। যেমন— প্রথমত, সভ্যতার পুনর্জন্ম— সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে একটি। তারপরেও ভারত এখনও প্রযুক্তিগত স্টার্টআপের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ১৯৯১ সালে উদারীকরণ নীতির পর থেকেএই দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রসারিত হয়। কয়েক শতাব্দী ঔপনিবেশিক শাসনে থাকার পরেও সম্প্রতি ভারত পুনর্জন্ম পেয়েছে। তাই সরাসরি ল্যান্ডলাইন ফোন থেকে মোবাইল বা নগদ থেকে ইউপিআই সিস্টেমের মধ্যে আসতে পেরেছে।

দ্বিতীয়ত, আন্ডারডগ মিলিওয়োর— কোনও কিছুর উন্নতি হচ্ছে, এটা পর্যবেক্ষণ করার অর্থ এই নয় যে, সেটা ইতিমধ্যেই এক নম্বরে রয়েছে। ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে একটি হলো, ভারতীয়রা নিজেদের 'আন্ডারডগ' বলে মনে করে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী 'ওভারডগ' নয়, 'আন্ডাররেটেড আন্ডারডগ'-– অর্থাৎ জয়ের সুযোগ আছে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কোও গ্যারান্টি নেই। বালাজির তরফে আরও জানানো হয়, ঋত্বিক রোশন অভিনীত 'সুপার ৪০' সিনেমাও একটি বড়ো বার্তা দেয়। ভারতীয়রা জানে যে, তারা ১ নম্বর নয়, এমনকী ২ নম্বরও নয়। কিন্তু প্রবাসীরা এটা দেখতে সাহায্য করে যে, ভারতীয়রা বিশ্বমানের হতে পারে এবং ভারত নিজেই বিশ্বমানের হয়ে উঠতে পারে।

তৃতীয়ত, বিকেন্দ্রীভূত প্রবাসী-ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তি হলো, প্রবাসী ভারতীয়রা। এই শতাব্দীতে চীন বিশ্বের সেরা বলে ঢক্কানিনাদ করতে পারে। কিন্তু ভারত প্রকৃতই বিশ্বের সেরা হওয়ার পথে রয়েছে। তাই ভারতের উন্ন চীনের থেকে ভিন্ন দেখাবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, ভারতীয়রা যে কোনও জায়গায় যেতে ইচ্ছুক ও সক্ষম। কিন্তু পশ্চিম দুনিয়ার মানুষদের বেশিরভাগই অন্যত্র যেতে ইচ্ছুক নয়। কারণ তারা এখনও মনে করে যে, তাদের সমাজই একমাত্র স্থান যেটি 'প্রথম বিশ্ব'। চীনারা ক্রমবর্ধমানভাবে চলাচল করতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ চীন যদি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র হয়, তাহলে ভারত বিকেন্দ্রীভূত প্রবাসী।

চতুর্থত, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল— বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র একীভূত হওয়ায় ভারত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ (ক) ভারতের পুনর্জন্ম হয়েছে, (খ) ভারতীয়রা জানে যে তারা বেড়ে উঠছে অর্থাৎ এখনও আন্ডারডগ এবং (গ) প্রবাসীদের উপর অনেক বেশি ফোকাস করে, যার ফলে ভারতের উন্নয়ন চীনের উন্নয়ন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে চলেছে। ১৯৯১ সালে ভারত নিজেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। আর এখন উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এছাড়া গত দশ বছরে ভারতের ইন্টারনেট সংযোগ, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবে বিশ্বের মঞ্চে বিনিয়োগের অন্যতম স্থান হয়ে উঠেছে ভারত।

গত দশ বছরে ভারতের ইন্টারনেট সংযোগ, ডিজিটাল পেমেন্ট এবং পরিকাঠামোগত ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবে বিশ্বের মঞ্চে বিনিয়োগের অন্যতম স্থান হয়ে উঠেছে ভারত।

নদীগর্ভ থেকে উদ্ধার হলো রামলালার সাদৃশ্যযুক্ত বিষ্ণুমূর্তি ও প্রাচীন শিবলিঙ্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নদীগর্ভ থেকে উদ্ধার হলো এক প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি। ঘটনাস্থল কর্ণাটক। তবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, উদ্ধার হওয়া বিষ্ণুমূর্তিটির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে সম্প্রতি অযোধ্যার রামমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রামলালার মূর্তির। বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে একটি শিবলিঙ্গও। ঘটনাস্থন কর্ণাটকের রায়চুর জেলার দেবাসুগুর গ্রাম। এই গ্রামের পাশ দিয়ে হয়ে গিয়েছে কৃষ্ণা নদী। সেই নদী থেকে উদ্ধার হয়েছে এই মূর্তিদুটি। নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ চলাকালীন এক মাঝি নদী থেকে মূর্তিটি উদ্ধার করেন এবং দ্রুত স্থানীয় প্রশাসনে খবর পাঠান। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা অযোধ্যার রামমন্দিরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রামলালার মূর্তির সঙ্গে নদী থেকে উদ্ধার হওয়া প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তির মিল দেখে স্তম্ভিত। গত ৭ ফেব্রুয়ারি আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা বিষয়টি জানিয়েছেন। বিষ্ণুমূর্তি ও শিবলিঙ্গটি তাদের অধীনে রয়েছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপিকা ড. পদ্মজা দেশাই বলেন, রামলালা যেমন একটি পেডেস্টালের ওপর স্থাপিত, তেমনই বিরল কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত এই বিষ্ণুমূর্তিও একটি পেডেস্টালে স্থাপিত। রামলালার মূর্তির চারপাশে যেমন দশাবতার অঙ্কিত, তেমনই এই মূর্তির চারপাশেও দশাবতার মূর্তি রয়েছে। আলাদা করে বিষ্ণুমূর্তিটির প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করেন তিনি। তিনি দেখান, এই বিষ্ণুমূর্তিটি যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে (স্ট্যান্ডিং পসচার অব দ্য আইডল), সেটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। মূর্তিটিতে দশাবতার ভগবানের প্রতিরূপ খোদিত রয়েছে। মূর্তি দুটি একাদশ শতাব্দীর, কল্যাণ চালুক্য বংশের সমসাময়িক। মূর্তিটিকে নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল ইসলামিক শাসকের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। যেস্থানে মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়েছে, সেখানে অতীতে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে ১৬৩টি সংঘর্ষ হয় বিদেশি শাসকদের। ইসলামি শাসকদের হাত থেকে স্থানীয়দের পূর্বপুরুষেরা মন্দির বাঁচানোর চেষ্টা করলেও তাদের বর্বর যুদ্ধনীতি ও ধর্মীয় ঘৃণার কাছে পরাস্ত হয়। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী মূর্তি পূজক ও বহু-ঈশ্বরবাদীদের প্রতি প্রভূত ঘৃণা ভারতীয়

উপমহাদেশের মঠ, মন্দির, স্থাপত্য, বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস ও নারীদের সম্মানহানির প্রধান কারণ।

নদীগর্ভ থেকে আবির্ভূত এই বিষ্ণুমূর্তি স্থানীয়দের পূর্বপুরুষদের বলিদানের কথা স্মরণ করানোর সঙ্গে যেন আরও একবার ইসলামিক শাসক কর্তৃক রক্তাক্ত ইতিহাসকে মনে করিয়ে দিয়ে যায়।

ফরিদপুরে প্রতিমা ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পরপর প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে চলেছে বাংলাদেশের ফরিদপুরে। হিন্দু মন্দিরে হামলা করে প্রতিমা ভাঙচুরের সময় এক জেহাদিকে হাতেনাতে ধরে ফেলে স্থানীয়রা। এরপর তাকে গাছে বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। প্রতিনিয়ত এই ধরনের ঘটনায় ফরিদপুরের হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাংলাদেশের

ফরিদপুর শহরের শোভারামপুরে ইসকনের রাধাগোবিন্দ মন্দির চত্বরে নির্মীয়মাণ সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর করে এক ইসলামিক উগ্রপন্থী। একই সঙ্গে সে নানা অশ্রাব্য গালিগালাজও করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হন মন্দিরের পূজারি ও ভক্তরা। মূল মন্দিরে প্রবেশের আগেই জঙ্গিকে ধরে ফেলেন তারা। এরপর মন্দির চত্বরে একটি গাছে ওই জেহাদিকে বেঁধে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল ফরিদপুর শহর লাগোয়া কৈজুরী তাম্বুলখানায়। বাসন্তী পুজোর জন্য নির্মীয়মাণ দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করে দুষ্কৃতীরা। ওইদিন রাত ১০টা নাগাদ মন্দির থেকে বাড়ি গিয়েছিলেন মন্দিরের কর্মকর্তারা। পরদিন সকালে মন্দিরে এসে দেখেন প্রতিমা ভাঙা। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছয়। অভিযোগ দায়ের করা হয়। তবে ওই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। প্রসঙ্গত ২০২১ সালে এই মন্দিরেই কালী মূর্তি ভাঙচুর হয়েছিল। স্থানীয়দের বক্তব্য, ফরিদপুরের মতো শান্ত এলাকায় জেহাদি শক্তি বিভাজন সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। গত ৭ তারিখের ঘটনায় ধৃতকে জেরা করে তাদের সন্ধান পেতে চাইছে পুলিশ। একইসঙ্গে দুটি ঘটনায় নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে স্থানীয় হিন্দুরা।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাও, চৌধুরী চরণ সিংহ ও প্রয়াত বিজ্ঞানী ড. এম.এস স্বামীনাথনকে মরণোত্তর ভারতরত্ন সম্মান প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ৯ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান— 'ভারতরত্ন' (মরণোত্তর) সম্মানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংহ, পিভি নরসিমা রাও ও প্রয়াত বরেণ্য কৃষিবিজ্ঞানী ড. এম.এস স্বামীনাথনকে ভূষিত করার বিষয়টি ঘোষণা করেন। তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গল নিবাসী, নেহরু-গান্ধী পরিবার বহির্ভূত প্রথম কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাও ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সরকারের সময়ে ভারতে আর্থিক সংস্কারের কাজের সূচনা হয়। ২৮ জুলাই, ১৯৭৯ থেকে ১৪ জানুয়ারি, ১৯৮০ পর্যন্ত সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন কৃষক ও শ্রমিক সমাজের বরেণ্য নেতা চৌধুরী চরণ সিংহ। প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ড. এম.এস স্বামীনাথন ভারতে সবুজ বিপ্লবের অন্যতম জনক ও খাদ্যে ভারতের স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে একজন পথিকৃৎ। প্রধানমন্ত্রী মোদীজী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, দীর্ঘদিনের বিধায়ক ও সাংসদ, বিদ্বান ও পণ্ডিত রাজনীতিবিদ পিভি নরসিমা রাও, তাঁর আমলে দেশে সময়োপযোগী, প্রভূত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহ ছাড়াও দেশের কৃষক সমাজের অধিকারের লড়াইতে জীবন অতিবাহিত করা, দীর্ঘ সংসদীয় জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিংহের অবদান স্মরণ করেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নেতৃত্বদানকারী, দূরদর্শী, কৃষিক্ষেত্রে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের দিশারী প্রয়াত বিজ্ঞানী, ভারতীয় সবুজ বিপ্লবের অন্যতম জনক ড. এম.এস স্বামীনাথনের অবদানও বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৮ নৌসেনাকে মুক্তি দিল কাতার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কাতারে বন্দি ৮ জন প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল কাতারের আদালত। সেই নির্দেশ নিয়ে চলে টানাপোড়েন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, ওই ৮ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৭ জন ইতিমধ্যে দেশে ফিরেও এসেছেন। কাতারের এই সিদ্ধান্ত ভারতের পক্ষে বড়ো কূটনৈতিক জয়। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, 'কাতারের সংস্থায় কর্মরত আট প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিককে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাতার। আমরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। ওঁদের মধ্যে সাত জন ইতিমধ্যে দেশে ফিরেছেন'। গত ডিসেম্বরে ভারতীয় নৌসেনাদের মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেছিল কাতারের আদালত। সাজা কমিয়ে তাঁদের কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ভারত সরকারের তরফে কাতারের আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে সাজা পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয়। তারপরেই ওই আধিকারিকদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নেয় কাতার। সাত প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিক দিল্লিতে ফিরেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ ছাড়া আজ আমাদের পক্ষে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হতো না। ভারত সরকারের ক্রমাগত চেষ্টার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে'। কাতারে একদা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ওই ৮ আধিকারিক হলেন, ক্যাপ্টেন নভতেজ সিংহ গিল, ক্যাপ্টেন বীরেন্দ্র কুমার বর্মা, ক্যাপ্টেন সৌরভ বশিষ্ঠ, কমান্ডার অমিত নাগপাল, কমান্ডার পূর্ণেন্দু তিওয়ারি, কমান্ডার সুগুণাকর পাকালা, কমান্ডার সঞ্জীব গুপ্তা ও নাবিক রাজেশ। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে ইজরায়েলের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে এই ৮ জন আধিকারিককে আটক করে কাতার।